।। ষষ্ঠ অধ্যায় ।।

সমকালীন ছোটগল্পকার ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা এবং বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান

১৯৪০ এর অগ্নিগর্ভকালে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভাব। ফলে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা যেমন তাঁর চেতনায় ক্রিয়াশীল তেমনি যুদ্ধ-পরবর্তী অভিঘাত সামাজিক ভাঙন, অবক্ষয়, নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের অসহায়তা, মানবিক মূল্যবোধের বিনষ্টি প্রভৃতিও তার সংবেদনশীল মনে ছায়াপাত করেছিল গভীরভাবে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মারী মড়কের তাণ্ডব, মন্বন্তরের কালগ্রাস ও ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। নিজে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু হওয়ার কারণে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সহায় সম্বলহীন মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রামের সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। নিজে কলকাতায় চলে আসার পরেও পূর্ববঙ্গে (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান) পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা মানুষের তথাকথিত Impractical মনোভাবকেও তিনি তাঁর অনেক গল্পের সঙ্গে 'পালঙ্ক' গল্পেও রূপদান করেছেন। দেশ-সমাজ-সময়ের এক অস্থিতির সময়ে তিনি আবির্ভূত হলেন, কিন্তু এই সময়ের বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, মানবিক মূল্যবোধের বিনষ্টি, সামাজিক ক্লেদ-পঙ্কিলতাকে তিনি তাঁর সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন বা বিষয় বা আশ্রয় করলেন না। নিজের মানসিকতাকে বুঝে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ কেবল 'ভালোবাসার গল্পই' রচনা করলেন। সমকাল তাঁর লেখায় ছায়াপাত করলো, পটভূমি রচনা করলো, কিন্তুপ্রধান চরিত্র হয়ে উঠলনা।তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য গল্পকারদের থেকে এই বিষয়ে তাঁর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববাংলার শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে শৈশবকাল অতিবাহিত করায় তাঁর মানসিকতা মানুষের স্খলন, পতন, ত্রুটি, বিচ্যুতিকে বড় ক'রে দেখবার মতন ক'রে গড়ে ওঠেনি; যদিও তিনি জানতেন — "সংসারে অনাচার-অবিচার আর অত্যাচারের অভাব নেই। প্রেমের শক্তি যেমন শক্তি, প্রয়োজন বোধে ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিও তেমন।"[১] কিন্তু দেখা যায় তাঁর মন এই ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিকে উপেক্ষা করে নিস্তরঙ্গ সৌন্দর্যময়তার মধ্যেই আত্মতৃপ্তি লাভ করেছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিও এই সৌন্দর্যময়তার মধ্যেই মুক্তি অন্বেষণ করেছে। যেহেতু এই মানসিকতা নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হয়েছেন সেইহেতু সৎসাহিত্য রচনা করতে গিয়ে মানুষের স্খলন, পতনের ছবিও তিনি অঙ্কন করেছেন কিন্তু তাতে নির্মম হতে পারেননি। পতনোন্মুখ মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন কিন্তু সেই পতনে নিজেও বেদনা বোধ করেছেন; মানুষের দুর্বলতাকে দেখিয়েছেন কিন্তু মানুষ যেখানে সেই দুর্বলতাকে জয় করতে পেরেছে সেখানেই অঙ্গুলি সংকেত করেছেন অধিক পরিমাণে। 'রসাভাসে'র মত গল্প তিনি রচনা করেছেন কিন্তু ভয়াবহ সর্বনাশের মুখে দাড়িঁয়ে মানুষের মানবিকতার জাগরণ সেখানেও প্রধান হয়ে উঠেছে। সমকালীন অন্যান্য গল্পকারদের থেকে এই

বিষয়েও তাঁর পার্থক্য দেখা যায়। সময় ও সমাজের অভিঘাতকে তিনি অতিক্রম করেছেন আর এই অতিক্রম তিনি করেছেন সচেতনভাবেই, ফলে স্বতন্ত্র একটি গল্পের জগৎ নির্মিত হয়েছে যেখানে চিত্রিত হয়েছে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা আর রূপলাভ করেছে পারিবারিক জীবনের গন্ডির মধ্যে ক্রমাগত আবর্তিত মানবমনের টানাপোড়েন। মানবচরিত্রের অন্ধকার দিকগুলিকে খুঁড়ে না তুলে এনে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, ভালোবাসা, কর্তব্যবোধ, মমতা, সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণ ও সুকুমার বৃত্তি প্রভৃতি দিকগুলি দেখিয়েছেন এবং ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও অসহায় অথচ হার না মানা মানুষের লড়াইকে তুলে ধরেছেন নরেন্দ্রনাথ। চল্লিশের দশক ও তার পরবর্তী যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, রাজনৈতিক সংঘাত ও সংঘর্ষের তান্ডব চলছিল তার আঁচ বাঁচিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষের অসীম রহস্যময় মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজেই ব্যস্ত থেকেছেন তিনি। এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন — "সমাজে শঠতা আছে, ক্রূরতা আছে, তা আমি জানি। হিংসা বিদ্বেষেরও অভাব নেই। কিন্তু সমাজ জীবনের এই অন্ধকার দিকের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় কম।... শান্ত মধুর ভাবই আমার রচনায় বেশি।... জীবনের পঙ্কিল অথবা ক্লেদাক্ত দিকে আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা তেমন কিছু নেই। আমার মেজাজ রোমান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়। তাই মহত্বই আমায় আকর্ষণ করে বেশি।"[২]

এ বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্যও প্রাণিধানযোগ্য — "নরেন্দ্রনাথ মিত্র মূলত মধ্যবিত্ত বিবেকের ব্যবচ্ছেদ করতে উৎসাহী — কিন্তু বিবেককে বর্জন করতে আগ্রহী নন। তিনি বাস্তবিক অর্থেই 'রোম্যান্টিক সোন্দর্যপ্রিয়' এবং 'শান্ত মধুর ভাব'-এ বেশি তৃপ্তি পান — তাই মধ্যবিত্ত মানুষদের পাপ ও পদস্খলনের চিত্র আঁকার সময় নির্মম হননি, বেদনাহত হয়েই বরং তার সহমর্মী হয়েছেন। অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ মিত্র মধ্যবিত্ত ভাঙনকে বিবেকের তাড়নায় গল্পের বিষয়ীভূত করে হৃদয়ের মানব্যে যাচাই করতে যতটা উৎসুক, সে সময়ের অন্য লেখকদের মধ্যবিত্ত কথায় ততটা দেখা যায়নি। আর এখানেই সমসময়ের লেখক ভাবনা থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য, একক পথ চলা।"[৩] —এই মন্তব্য থেকে দুটি জিনিস স্পষ্ট —

এক. নরেন্দ্রনাথ মধ্যবিত্ত মানুষের রোমান্টিক চেতনার গল্প লেখক। এবং

দুই. একজন মানবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রচনাকার।

এখন দেখা যাক নরেন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট মানসিকতা ও গল্পরচনার রীতি বাংলা ছোটগল্পের জগতে কোন্ বিশিষ্ট স্থান লাভের উপযোগী। নরেন্দ্রনাথ যখন বাংলা ছোটগল্পের জগতে আর্বিভূত হন তখন যে সকল গল্পকার সৃষ্টিশীল ছিলেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমুখ ছোটগল্পকারেরা তখন শুধুমাত্র যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিতই নন পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াশীলও বটেন। শক্তিশালী এই সকল গল্পকারের সৃষ্টিশীলতার কালে সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হয়েও নরেন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের

জগতে কেমনভাবে নিজের বিশিষ্ট স্থানটি নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হলেন তা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবকাল ও সাহিত্যিক হিসাবে গড়ে ওঠার সময়কালের আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন দেশ ও বিদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কিছুটা পরিচয় নেবার প্রয়াস করা হয়েছে। এখন সেই সময়কালে বাংলা সাহিত্যজগতের প্রেক্ষাপটটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে নরেন্দ্রনাথের সাহিত্য জগতে আর্বিভাবের অব্যবহিত পূর্বেই প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-০৯৮৮), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) প্রমুখেরা বাংলা সাহিত্য জগতে 'কল্লোলযুগ' আনয়ন করেছেন। ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রকাশ, ফ্রয়েডের শিষ্য অ্যাডলার ও য়ুং এবং হ্যাভলক এলিস প্রমুখের দেহবাদী যৌনতা নির্ভর ব্যাখ্যা, বার্নাড শ ও ফেবিয়ানদের নব অর্থনৈতিক চিন্তা— প্রভৃতির দ্বারা 'কল্লোলযুগে'র লেখকেরা গভীর ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। জীবন সম্পর্কে আশাহীনতা, শূন্যতাবোধ, বিষাদচেতনা ও অবজ্ঞাত-অপজাত মানুষের জীবনযুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ দেহকামনার স্বীকৃতি এই লেখকদের অবলম্বন ছিল আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল রবীন্দ্রবিরোধিতা। শরৎচন্দ্রের দরদ, আবেগ ও ভাবাবেগের বন্যাকে রোধ করে প্রথম বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর আদিম গোষ্ঠীর নরনারীর প্রেম ও পারস্পরিক যৌনাকর্ষণের তীব্র জটিল রহস্যময়তাকে শিল্প নিপুণতা ও নির্মম নিরাসক্তিতে বর্ণনা করলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬)। শৈলজানন্দকে কল্লোলগোষ্ঠীর বলে চিহ্নিত করা হলেও সমালোচক বলেন — "তাঁকে কল্লোল-গোষ্ঠীর একজন বলা হয়। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। তাঁর ছোটগল্পে বাস্তবতা নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই, দারিদ্র্যের আস্ফালন নেই, লালসার অসংযম নেই। পাঠককে চমকে দেবার প্রয়াস নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি আসেননি। বাস্তব-অভিজ্ঞতাবিহীন বিদেশী ভাবাদর্শ প্রাণিত গল্প লিখে আসর মাৎ করার চেষ্টা তাঁর ছিল না।"[৪] শৈলজানন্দের গোত্র নির্ণয়ে অপর সমালোচক বলেন — "শৈলজানন্দের মৌল প্রকৃতি 'কল্লোল চেতনা'র থেকে আমূল পৃথক।"[৫] প্রকৃতপক্ষে 'কল্লোল পত্রিকা'য় রচনা প্রকাশিত হলেই রচনকার মন ও মানসিকতায় কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হবেন তা ঠিক নয়। 'প্রবল বিরুদ্ধবাদ' ও 'বিহ্বল ভাববিলাসে'র মানদণ্ডেই শৈলজানন্দ কল্লোল গোষ্ঠী থেকে পৃথক শ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েই তিনি কয়লাকুঠির শ্রমিক শ্রেণির মানুষের জীবন যন্ত্রণা, কামনা, বাসনা, শোষণ, বঞ্চনা ও দৈনন্দীন জীবনযাপনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'কয়লাকুঠি', 'মা', 'নারীরমন', 'নারীমেধ', 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা' ইত্যাদি গল্পে খনি জীবনের বাস্তব চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি শেষোক্ত গল্পে শহর কলকাতার পটভূমিতে পরিস্ফুট হয়েছে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের শোচনীয় বিপর্যয়ের কাহিনি। শৈলজানন্দ বাংলা ছোটগল্পে এক নতুন ধারার সূচনাকারী এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের যক্ষপুরীর মানুষদের

লাঞ্ছনা ও জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তির প্রেরণা আরও বেশি জীবন সংরক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে শৈলজানন্দের গল্পে। 'জোহানের বিহা' নামক তাঁর গল্প পাঠ করে তারাশঙ্কর গল্প লেখায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। (সূত্র — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা — ১৮৪)। এ দিক থেকেও শৈলজানন্দ বিশেষ মনোযোগের দাবীদার।

কল্লোল গোষ্ঠীর প্রধান তিন লেখক হলেন যথাক্রমে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্রমিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। 'An Acre of green grass' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু বলেন, তাঁরা হুইটম্যান, রাশিয়ান লেখক ও স্ক্যান্ডিনেভিয় লেখকদের রচনা পড়তেন। এই লেখকদের রচনাই প্রাণিত করেছিল কল্লোলীয়দের। স্ক্যান্ডিনেভিয় লেখক ন্যুট হ্যামসুনের 'Pan' উপন্যাসটি ১৯৩০ সালে অচিন্ত্যকুমার অনুবাদ করেন। নরউইজান নোবেলজয়ী লেখক ন্যুট হ্যামসুনের গল্প মনোবিকলন তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল আর অচিন্ত্যকুমার হ্যামসুনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাস প্রত্যক্ষভাবে হ্যামসুন প্রভাবিত।

৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অচিন্ত্যকুমারের রচনায় 'কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র' ও 'অজস্র বৈচিত্র্য' দেখে তাকে একটি পত্র লিখেছিলেন। সেইখানে তিনি লেখেন — "বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুন প্রবৃত্তি।"[৬] একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় কল্লোলীয় ভাবধারায় যাবতীয় ধ্যান ধারণার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল অচিন্ত্যকুমারের মধ্যে। এ কারণেই সমালোচক বলেন — "উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ভবঘুরে জীবন যাত্রা, মিথুনাসক্তি, স্থবির ও প্রতিষ্ঠিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উগ্র যৌনচেতনা ও যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা, প্রচলিত নীতি ও মূল্যবোধের অস্বীকৃতি, আত্মবিস্তারী প্রেমচেতনা, আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তির অস্থিরতা,ব্যর্থতা, স্বপ্ন প্রবণতা ;সবটা মিঁয়ে অচিন্ত্যকুমার।"[৭]

'দুইবার রাজা' (১৯২৭), 'যে কে সে', 'ধন্বন্তরি', 'ছুরি' প্রভৃতি গল্পে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনসংগ্রামে পরাভবের কাহিনি, প্রতারিত প্রবঞ্চিত মানুষের করুণ আর্তি, ধনী কর্তৃক বঞ্চনা প্রভৃতি বিষয় শিল্পিত রূপলাভ করেছে। চাকরি সূত্রে অচিন্ত্যকুমার বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং এই ভ্রমণের কালে তিনি যে অজস্র মানবচরিত্র দেখেছেন, সেই অভিজ্ঞতার বিপুল ভাণ্ডার তিনি উজার ক'রে দিয়েছেন তাঁর গল্পের জগতে। পরবর্তী পর্যায়ে অচিন্ত্যকুমার মফঃস্বল শহর ও গ্রাম বাংলাকে তাঁর গল্পের পটভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন। 'যতনবিধি' (১৯৪৪), 'সারেঙ' (১৯৪৭), 'হাড়ি মুচি ডোম' (১৯৪৮) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে গ্রামবাংলার যে চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন সত্যিই তা তুলনারহিত। এছাড়া নরেন্দ্রনাথ মিত্র ব্যতীত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তই মুসলমান সমাজকে নিয়ে এত অধিক পরিমাণ গল্প রচনা করেছেন। মুসলমান সমাজকে নিয়ে রচিত গল্পে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ব্যবহার করেছেন বহু আরবী

ফার্সী শব্দ। তিনি গ্রামজীবন ও গ্রামের মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন আর তাঁর সেই অভিজ্ঞতাকে তিনি রূপদান করেছেন তাঁর ছোট গল্পে। অচিন্ত্যকুমারের গল্পের চরিত্ররা অধিকাংশই উঠে এসেছে নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ থেকে, এই দিক থেকেও নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অচিন্ত্যকুমার ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েরই পছন্দের ক্ষেত্র ছিল কবিতার জগৎ ফলে উভয়েরই রচনায় একটি কাব্যময়তার প্রভাব যেন পরিলক্ষিত হয়। এই সাদৃশ্য ব্যতীত অবশ্য নরেন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে অচিন্ত্যকুমারের রচনার বৈসাদৃশ্যই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

বুদ্ধদেব বসুও অচিন্ত্যকুমারের মতই কবি। কাব্যময়তা উভয়েরই রচনার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। বুদ্ধদেব বসুর ছোট গল্পের জগতে আর্বিভাব 'রজনী হল উতলা' গল্পটির মধ্য দিয়ে। 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত। অচিন্ত্যকুমারের বাংলা সাহিত্য জগতে আর্বিভাব 'কল্লোল' পত্রিকাকে অবলম্বন করে হলেও বুদ্ধদেব বসুর অবলম্বন ছিল 'প্রগতি' প্রত্রিকা।

'অভিনয়, অভিনয় নয়' (১৯৩০), 'রেখাচিত্র' (১৯৩১), 'এরা আর ওরা' (১৯৩২), 'অদৃশ্য-শত্রু' (১৯৩৩), 'মিসেস গুপ্ত' (১৯৩৪), 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৩৪), 'শ্বেতপত্র' (১৯৩৪), 'অসামান্য মেয়ে' (১৯৩৫), 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' (১৯৩৫) প্রভৃতি গল্প সংকলনে গ্রথিত গল্পগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেন — "তাঁর ছোট গল্পে বিষয়বস্তু ও রচনারীতির বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু তাঁর গল্পের মূল উপাদান কী, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, ভালোবাসা;— জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা-ই তীব্র ও প্রবলভাবে উপস্থিত। এই ভালোবাসার অঙ্গীকার তাঁর ছোটগল্পের জগৎকে ভরে রেখেছে।"[৮] সমালোচকের এই বক্তব্যের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যকে মিলিয়ে নিয়ে পড়লে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের একটি সাদৃশ্যের স্থান খুঁজে পাওয়া যায়। নরেন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্প লেখার গল্প' — প্রবন্ধের শেষে বলেন — "নিজের স্বভাবকে বুঝে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি। সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা । তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।"[৯] এই ভালোবাসার গল্প লেখার বিষয়টি যেন বুদ্ধদেব বসু ও নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উভয়ের রচনাতেই জীবনের জটিল-কুটিল রূপ, মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষোভ, বিক্ষোভ, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতির রূপও ফুটে উঠেছে, কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়নি। বরং জীবনসংগ্রামের কঠোরতা, জীবন ও জীবিকার লড়াই তাদের গল্পে স্থান লাভ করলেও স্বপ্ন, সৌন্দর্য, আশা ও ভালোবাসাই মানুষের প্রধান অবলম্বন বলে তাঁরা গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু মুখ্যত নাগরিক লেখক। আলোচকের মতে — "বুদ্ধদেব সর্বার্থে ও সদর্থে নাগরিক।"[১০] প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর ছোটগল্পের পটভূমি হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেছে নিয়েছেন কলকাতা অথবা ঢাকা নগরীকে। নগরজীবনকেন্দ্রিক তাঁর রচনার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের

রচনারও সাদৃশ্য আছে কারণ, নরেন্দ্রনাথেরও প্রথম দিকের গল্পগুলি ব্যতীত অধিকাংশ গল্পের অবলম্বন কলকাতার নগর জীবন। তবে বুদ্ধদেব বসুর চিত্রিত চরিত্রদের মধ্যে যে রোমান্টিক ভাবপ্রবণতা দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের গল্পে যেন সেই চরিত্রের পরিচয় কম, এছাড়া ভাষারীতির ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসু যেমন বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেছেন, নরেন্দ্রনাথের ভাষা প্রয়োগ সেখানে সহজ সরলতায় পরিপূর্ণ। কাব্যময়তা নরেন্দ্রনাথের ভাষায়ও আছে, কিন্তু কাব্যময়তাই সেই ভাষার একমাত্র লক্ষণ নয়।

কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি হিসেবে সুবিখ্যাত হলেও তাঁর ছোটগল্পগুলিও শ্রেষ্ঠত্বের সীমালগ্ন। তাঁর 'পঞ্চশর' (১৩৩৬), 'বেনামী বন্দর' (১৩৩৭), 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৩৩৯), 'মৃত্তিকা' (১৯৩২),'অফুরন্ত '(১৩৪২), 'মহানগর' (১৯৪৩) প্রভৃতি গল্পসঙ্কলন স্বাধীনতার পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁকে একজন অসামান্য গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করেছিল। 'শুধু কেরাণী' গল্পটির মধ্য দিয়েই তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। মৃত্তিকা ও জীবনের অত্যন্ত কাছাকাছি তাঁর গল্পগুলির প্রধান বৈশিষ্ট সমাজ বাস্তবতা এবং জীবনের জটিলতার চিত্রণ এবং বিশ্লেষণ। শিল্পরীতির অসংযম ও ভাবাবেগের প্রাবল্য তাঁর গল্পে নেই বরং তাঁর গল্পগুলি বাংলা ছোটগল্প শিল্পের উৎকৃষ্ট শিল্পরীতির নিদর্শন রূপে পরিগণিত হতে পারে। গল্পের উপস্থাপনা, বিন্যাস, সমাপ্তি সব মিলিয়ে এক অখণ্ড শিল্পকৃতি তাঁর গল্প — এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তাঁর অসামান্য ভাষারীতি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প সম্পর্কে আলোচক বলেন— "প্রেমেন্দ্র মিত্র আবেগের শিল্পী নন, মননের শিল্পী। জীবনের নিছক রূপকার নন, মর্মভেদী বিশ্লেষক। তিনি বস্তুনিষ্ঠ শিল্পী। জীবনের ভাঙন ও অবক্ষয়ের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর লেখনী অকম্পিত, আবার জীবনের জটিলতার বিশ্লেষণে নিপুণ ব্যবচ্ছেদক।"[১১] প্রকৃতপক্ষে জীবনের দৈন্য, অসহায়তা, অপমান, বঞ্চনা, দুঃখ, বিকারগ্রস্ততা প্রভৃতিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অসামান্য শিল্প সৌকর্যে, নিপীড়িত মানুষের প্রতি অসীম সমবেদনায় সেগুলিকে প্রকাশ করেছেন। মানবমনের অন্ধকার জটিল কুটিল পথকে তিনি যেমনভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন বাংলা ছোটগল্পের জগতে তা তুলনারহিত। বাংলা সাহিত্যে গূঢ় বাস্তবতা আনয়ণে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন বলে সরোজ মোহন মিত্র মনে করেন। তিনি লেখেন — "১৯২৩ এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে শুধু কেরাণী, গোপনচারিণী ছোটগল্প এবং পাঁক উপন্যাস নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে গূঢ়তর বাস্তবতা অন্বেষণের স্পৃহা ও তৎপরতার একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।"[১২]

কল্লোলগোষ্ঠীর এই প্রধান তিন রচনাকারদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কল্লোলের লেখকেরা নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব সময়ে বাংলা ছোটগল্পের জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আবির্ভূত হলেও তাঁদের হাত ধরে নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যজগত তৈরি হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নির্দেশিত ছোটগল্পের যে বহমান ধারা তাতে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিলেন,নতুন উদ্দীপনার

সঞ্চার করেছিলেন। তীব্র রোম্যান্টিকতা ও রবীন্দ্রবিরোধিতা ছিল তাদের মূলধন। প্রচলিত ন্যায়নীতি, ঈশ্বর বিশ্বাস, সাহিত্যের সত্য-শিব ও সুন্দরের ধারণাকে সুতীব্রভাবে অস্বীকার করে সমাজের নীচুতলার অবজ্ঞাত, অবহেলিত, মানুষকে শিল্পের অঙিনাতে তুলে আনাই ছিল তাঁদের সাধনা। নরনারীর দেহ-সম্পর্ক বর্ণনায়, যৌনতার উন্মোচনে, মানব চরিত্রের অন্ধকারময় দিকগুলিকে অনাবৃত রূপে উন্মোচন ছিল তাঁদের ব্রত। কল্লোলগোষ্ঠীর এই মানসিকতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মানসিকতার সুবিশাল পার্থক্য বর্তমান আর তার ফলেই নরেন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতী কল্লোল-প্রভাবিত নয়, যদিও অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসু বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনাধারা বা শৈলীর সঙ্গে তাঁর কিছু কিছু সাদৃশ্য বর্তমান। তবে সব মিলিয়ে তাঁদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের অমিলই বেশি আর এর জন্য দায়ী নরেন্দ্রনাথের মানসিকতা, জীবনচেতনা ও প্রকৃতিচেতনার পার্থক্য, যা বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সহায়তা করেছে।

নরেন্দ্রনাথের অর্বিভাবের সময় বাংলা ছোটগল্পের জগৎ তথা সাহিত্য জগতে পূর্ণরূপে সৃষ্টিশীল ছিলেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায় — তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণ এই দুজন প্রায় একই সময়ে সাহিত্যজগতে আর্বিভূত হয়েছিলেন এবং এই দুজনই শরৎ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধান ও প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

তারাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত গল্প 'রসকলি' (ফাল্গুন ১৩৪৪, ১৯২৮) 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, শুধু তাই নয় তার পরবর্তী গল্প 'হারানো সুর' ও প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায় কিন্তু তাঁর শিল্পি সত্তার সঙ্গে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকদের কোন সাদৃশ্য নেই। বিভূতিভূষণ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কল্লোলগোষ্ঠীর তরুণ, শিক্ষিত, পাশ্চাত্যপ্রভাবিত লেখকদের সঙ্গে এ দুজনের মিল নেই, তাদের রচনার নৈরাশ্য যন্ত্রণা ও নঞর্থক মানসিকতার থেকেও এ দুজনের অবস্থান দূরবর্তী।

বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকার মাঘ সংখায়, ১৩২৮ বঙ্গাব্দে। 'কল্লোল' প্রকাশিত হবার দুবছর পূর্বেই তিনি সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হন এবং কল্লোলের উত্তাল সময়ের সঙ্গেই তাঁর সৃষ্টিকাল সমান্তরালভাবে চললেও কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর কোনো দূরগত সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া যায়না। বিভূতিভূষণ নাগরিক লেখক নন, তার অবলম্বনের বিষয় গ্রামজীবন। বিভূতিভূষণ গ্রামীণ, গার্হস্থজীবনের রূপকার; আস্তিক এবং চিরন্তন মানবধর্মে বিশ্বাসী। সমালোচকের ভাষায়— "পল্লীগ্রামের সাধারণ জীবনের সাধারণ মানুষ নিয়ে তাঁর কারবার। এরা অতিপরিচিত, খুবই বাস্তব। একান্ত পরিচিত বাস্তব বিষয় ও চরিত্র প্রকৃতি-সংস্পর্শে বিভূতিভূষণের গল্পে এক অসামান্যতা পেয়েছে।"[১৩]

বিভূতিভূষণ অনুভূতিপ্রবণ গল্পলেখক। রোম্যান্টিক কল্পনার সঙ্গে এই অনুভূতি প্রবণতার যোগে

তিনি তাঁর রচনার মধ্যে যে বিশিষ্ট ভাবের জগৎ সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা কেন বিশ্বসাহিত্যেই তুলনারহিত। এ বিষয়ে তাঁর কোনো পূর্বসূরী নেই এবং যথার্থ অর্থে নেই কোনো উত্তরসূরীও। তাঁর অবলম্বন পল্লীজীবন কিন্তু এই পল্লীজীবন শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত পল্লীজীবন নয়, যেখানে শরৎচন্দ্র তুলে আনছেন পল্লীগ্রামের বস্তুজীবনের নানান সমস্যার বাস্তব চিত্র। কল্লোলগোষ্ঠীও পল্লীজীবনের কথা চিত্রিত করেছে, পল্লীগ্রামের সহায় সম্বলহীন অসহায় দরিদ্র মানুষদের জীবনকথাকে, তাদের অভাব অভিযোগ, দুঃখবোধ, অসহায়তা মমত্বের সঙ্গে বাস্তবগ্রাহ্য রূপেই তাঁদের রচিত গল্পে স্থান লাভ করেছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের রচনায় পল্লীগ্রামের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যানুভূতি এবং ঈশ্বরানুভূতির আবেশ। আলোচকের লেখায় বিভূতিভূষণের প্রকৃত স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে — "বিভূতিভূষণ জাত-রোমান্টিকের মতোই গ্রামবাংলাকে দেখেছেন প্রকৃতি-ভাবুকতায়। ... বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি দূর থেকে দেখা কোন অস্তিত্ব নয়, বিলাসের কাম্যবস্তু নয়, প্রকৃতি তাঁর অস্তিত্বের প্রেরণা, মাটি, মাটির সজীব প্রাণ স্বভাব। প্রকৃতিই তাঁর রক্ত-মাংস-মজ্জা-প্রাণ। আর এই প্রকৃতি নগর-জীবনের কৃত্রিমতায় ধূসর নয়, গ্রাম জীবনের সহজ, স্বতস্ফূর্ত সজীবতায় চিরসবুজ।"[১৪]

নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পূর্বেই বিভূতিভূষণের 'মেঘমল্লার' (১৯৩২), 'মৌরীফুল' (১৯৩২), 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪), 'জন্ম ও মৃত্যু' (১৯৩৮), 'কিন্নর দল'(১৯৩৮), 'বেনীগির ফুলবাড়ি' (১৯৪১), প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গেছে। নরেন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা পল্লীগ্রামের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে তবে বিভূতিভূষণের বিশিষ্ট প্রকৃতিতন্ময়তা নরেন্দ্রনাথের রচনায় অনুপস্থিত। এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য উপস্থাপন করা যায় যে নরেন্দ্রনাথের সুবিশাল গল্পের ভাণ্ডারে 'আয়না' গল্পটি ছাড়া কোনো ভূতের গল্প বা অতিপ্রাকৃত গল্প নেই, অপরদিকে বিভূতিভূষণ সারা জীবন ধরেই কিছু না কিছু অতিপ্রাকৃত রসের গল্প লিখেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'বউচণ্ডীর মাঠ', 'অভিশপ্ত', 'খুঁটি দেবতা', 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প' প্রভৃতি অলৌকিক রসাশ্রিত গল্পের নাম করা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে তারাশঙ্করের প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায়। তবে তিনি কল্লোল চেতনার লেখক নন। তিনি তাঁর গল্পরচনার প্রেরণা হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর রচনার কথা স্বীকার করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প 'কালিকলম' পত্রিকায় পাঠ করে তিনি উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন।(সূত্র— তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'আমার সাহিত্যজীবন')। সুকুমার সেন তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলে উল্লেখ করেছেন । তাঁর ভাষায় — "তারাশঙ্করকে শৈলজানন্দের সহযাত্রী বলিতে পারি। শৈলজানন্দ কয়লাকুঠির সাঁওতাল জীবন লইয়া সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কাহিনী রচনার পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কর লইলেন তাঁহার দেশ দক্ষিণপূর্ব বীরভূমের সাধারণ লোকের জীবন — পুরানো গ্রামের জমিদার - ঘর

হইতে নদীচরের মাল-বেদে পাড়া পর্যন্ত।"[১৫] সমালোচকের এর একথা সত্য বলে প্রমাণিত হয় যখন দেখি একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিজের গল্পের জগৎকে তারাশঙ্কর সীমাবদ্ধ রাখেন। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারাশঙ্করের গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য সীমিত নয় বরং রাঢ়বঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর অশেষ ও অন্তহীন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের কারণে তা বিচিত্র পথগামী। নিজের হিমালয়সদৃশ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে তিনি যেমন রূপদান করেছেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্রের ঐতিহ্য ধরে রাখবার লড়াইকে তেমনি তুলে এনেছেন বিভিন্ন ও বিচিত্র বৃত্তিধারী নিম্নবিত্ত অন্ত্যজ মানুষের বিচিত্র জীবনকে—তাদের প্রেম-ঈর্ষা, আদিমতা,যৌনতাময় 'অঙের খেলা' কে। তিনি নিজে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিষয় সম্পর্কে বলেছেন যে তাঁর রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বিলীয়মান জমিদার শ্রেণি, এছাড়া বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকঘরকরা প্রভৃতি সমাজের নিম্নবিত্ত শ্রেণি চরিত্রের কথা। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেই সব মানুষ যারা নিজেদের বিচিত্র পেশার কারণে সমাজে 'স্বতন্ত্র ও অভিনব' হয়ে ওঠে। তাঁর 'রায়বাড়ি', 'জলসাঘর', 'সাড়ে সাত গণ্ডার জমিদার', 'রাজপুত্র', 'ময়দানব' প্রভৃতি গল্পে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে বিলীয়মান জমিদার শ্রেণির দম্ভ, আভিজাত্য, অহংকার ও প্রাচীন হারানো ঐতিহ্যের জন্য গর্ব তেমনি প্রকাশিত হয়েছে মহিমাশূন্য বলহীন, শক্তিহীন, বিত্তহীন মানুষের হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস। অপরদিকে তাঁর 'ডাইনি', 'বেদেনী', 'নারী ও নাগিনী', 'তারিণী মাঝি', 'ডাক হরকরা' প্রভৃতি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে আদিমতাধর্মী জীবনের পরিচয়, অদ্ভুত জৈব-তৃষ্ণা ও আসক্তি এবং জৈব প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ।

'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হলেও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলগোষ্ঠীর নন —এ কথা যেমন তিনি নিজে বলেছেন ('আমার সাহিত্যজীবন') তেমনি 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও স্বীকার করেছেন। তিনি 'কল্লোল' নন একথা সত্য হলেও বিষয়বস্তু ও ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে অনেকক্ষেত্রেই তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর মতোই অখ্যাত-অবজ্ঞাত মানুষের অনাবৃত আদিমতাকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'বেদেনী','মেলা', 'যাদুকরী' প্রভৃতি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। অবশ্য এই সকল গল্পে আদিমতার অনাবৃত বর্ণনা আছে কিন্তু তা কল্লোল শ্রেণির নয়, এ বক্তব্যের সমর্থনে সমালোচকের উক্তিকে উদ্ধার করা যেতে পারে । তারাশঙ্করের 'মেলা' গল্পে পতিতাপল্লীর অনাবৃত বর্ণনা সম্পর্কে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী লেখেন — "এই নিরাবরণ বর্ণনার কোথাও 'বিদ্রোহের' চোখ্ ঝলসানো উত্তপ্ত দীপ্তি , কিংবা আত্মগ্লানির অবসাদ-জ্বালা বিন্দুমাত্রও উপস্থিত নেই। কারণ নৈর্ব্যক্তিক ঋজু ভঙ্গিতে শিল্পী যে অনাড়ম্বর তথ্য বর্ণনা করতে পেরেছেন, তার মূলে আছে 'কল্যাণ-স্নিগ্ধ পরিণাম' অঙ্কনের সুদৃঢ় প্রত্যয়।"[১৬] এই কল্যাণ-স্নিগ্ধ পরিণাম অঙ্কনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেই কল্লোলগোষ্ঠী অপেক্ষা তারাশঙ্করের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত ও স্বীকৃত।

তারাশঙ্করের গল্পের বিষয়গত দিক থেকে যদি প্রকরণগত দিকের প্রতি দৃষ্টি ফেরানো যায় তবে

দেখা যায় তাঁর গল্পগুলি অনেকাংশেই দীর্ঘবিন্যস্ত ও বিবৃতিধর্মী। সচেতন শিল্পভাবনা ও সূক্ষ্ম পরিমণ্ডলের অভাব যেন লক্ষ করা যায় তাঁর গল্পে। বিবৃতিধর্মী গল্পগুলি যেন আঙ্গিকগত দিক থেকে tale-এর পর্যায় ভুক্ত, তবে তাতে নাটকীয়তার অভাব নেই। সমকালীন গল্প লেখক বুদ্ধদেব বসু বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের অসাধারণ শিল্প সৌকর্য তারাশঙ্করের রচনায় অনুপস্থিত। এই বিষয়টি তাঁর শিল্পভাবনার সীমাবদ্ধতাকেই সূচিত করে কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন দিয়ে তিনি জীবন ও জগতকে দেখেছেন তাকেই তিনি যথার্থ জীবনরসিকের মত তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। তাই তিনি আর্টিষ্ট নন বরং যে জীবনরস অফুরান ও অপরাজেয়— তারই যথার্থ ও বলিষ্ঠ শিল্পি।

তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় এবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যকৃতীর কিছুটা পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) বাংলা ছোটগল্পজগতে আর্বিভাব 'অতসী মামী' গল্পটি রচনার মধ্য দিয়ে। 'অতসী মামী' ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়নি, তিনি কল্লোলগোষ্ঠীর সঙ্গে সগোত্রও নন কিন্তু তবুও তাঁর গোত্র নির্ণয়ে 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার তাঁর সম্পর্কে বলেন — "আসলে সে কল্লোলেরই কুলবর্ধন।" বুদ্ধদেব বসুও তাঁর 'An Acre of green grass' গ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাগত কল্লোলীয় বা 'belated kallolean' বলে অভিহিত করেছেন। এই সব আখ্যা সত্ত্বেও বলতে হয় মানিক বন্দোপাধ্যায় কল্লোলের ছিলেন না, শুধু তাই নয় কল্লোলের মাত্রাতিরিক্ত ফেনিল উন্মাদনা ও আবেগসর্বস্ব উচ্ছ্বাসকে তিনি একটু বিতৃষ্ণার চোখেই দেখতেন। কল্লোলের লেখকদের ভাষা ও ভঙ্গির তীক্ষ্ণতা ও নতুনত্ব, নতুন পরিবেশ ও চরিত্রকে আনয়ন করা এবং নরনারীর রোমান্টিক সম্পর্ককে বাস্তব গ্রাহ্য করে তোলার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাতে তিনি উল্লাসবোধ করলেও তাঁদের 'হালকা নোংরা রোমান্টিক ন্যাকামি' ('সাহিত্য করার আগে' ঃ 'লেখকের কথা') তাঁর মনে বিতৃষ্ণার জন্ম দিয়েছিল। তবে বাস্তবের রূঢ় নির্মম কঠিন চিত্রাঙ্কন তিনি করেছেন এবং তার পরিচয় আছে 'প্রগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্পে। যদিও তাঁর প্রথম রচনা 'অতসীমামী' একটি 'রোমান্সঠাসা অবাস্তব কাহিনি' কিন্তু এই রোমান্স মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধারণ ধর্ম নয় বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল ও যুগোপরবর্তী জনজীবনের শোভনতা, নীতিবোধ বিবিক্ত জীবনসংগ্রামকেই তিনি তাঁর অধিকাংশ গল্পে অসামান্য দক্ষতায় তুলে ধরেছেন। 'দুঃশাসনীয়', 'যাকে ঘুষ দিতে হয়', 'সাড়ে সাত সের চাল' প্রভৃতি গল্পগুলির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার দুটি সুস্পষ্ট পর্ব পরিলক্ষিত হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মার্কসবাদে দীক্ষার পর তাঁর রচনায় মার্কসবাদ থেকে প্রাপ্ত গভীর সমাজচেতনা যুক্ত হয়েছে। এর পূর্বে তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়েছে জটিল মনস্তত্ব ও যৌনতানির্ভর গল্প যা অসামান্য

বৈজ্ঞানিক যুক্তি-চিন্তা ও মননে সমৃদ্ধ এবং নিরাসক্ত দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। মার্কসবাদে দীক্ষার পর তাঁর রচনায় দেখা গেল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, কালোবাজারি এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতাময় পরিবেশে মানুষের সুস্থ জীবন উপভোগের বাসনা ও সংগ্রামকে তিনি এই সময় তাঁর ছোটগল্পে রূপদান করেছেন। সংগ্রাম ও প্রতিবাদী পটভূমিকায় রচিত গল্পগুলির মধ্যে 'সাড়ে সাত সের চাল', 'শিল্পী', 'হারানের নাতজামাই', 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

নরেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল' (১৯৪৫খ্রিস্টাব্দ,১৩৫৩ বঙ্গাব্দ) প্রকাশের পূর্বেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অতসীমামী'(১৯৩৫), 'প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭)', 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮)', 'সরীসৃপ(১৯৩৯)','বৌ'(১৯৪৩)'সমুদ্রের স্বাদ'(১৯৪৩), 'ভেজাল'(১৯৪৪), 'হলুদপোড়া'(১৯৪৫) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়ে গেছে। যদিও একথা সত্য যে, শক্তিশালী লেখক কেবল পরবর্তী লেখকদের নয় সমসাময়িক লেখকদেরও প্রভাবিত করতে সক্ষম, কিন্তু তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার প্রভাব নরেন্দ্রনাথের রচনায় বিশেষ কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়না। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব ও মানবমনের অন্তর্গূঢ় জটিলতায় বিশ্বাস স্থাপনকারী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতপক্ষে জগদীশ গুপ্তের সমগোত্রীয়। যদিও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট তথাপি সাদৃশ্যও কম নেই। উভয়ের গল্পেই মানুষের ক্রূরতা, হিংস্রতা ও পাশবিকতা অত্যন্ত নগ্ন ভাবে প্রকাশিত। সমালোচকও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তকে সমগোত্রীয় রূপে চিহ্নিত করে তাদের গোত্র নির্ণয়ে বলেন — "অন্ধকার জীবন-বৃত্তের রূপকার, কূটৈষণা ও অন্তর্গূঢ় জটিলতার নিরাসক্ত শিল্পী, জগৎ ও জীবন ব্যাপ্ত 'শয়তানি শক্তি'র চিত্রকর..."[১৭] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য থাকলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সংশয়, সন্দেহ, হতাশা, ব্যর্থতা ও অসহয়তাবোধ থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা আছে কিন্তু জগদীশ গুপ্ত একান্তই নেতিবাদী, প্রবলভাবে এক অন্ধ নিয়তির প্রভাবান্বিত হতাশাময় জগতের ও জীবনের চিত্র অঙ্কনে পারঙ্গম। এই কারণে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন — "জগদীশ গুপ্ত মানবজীবনের শুভ পরিণামে আস্থা স্থাপন করেননি। মানুষের জীবনব্যাপী সকল শুভ প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় বলে তার বিশ্বাস। আর এই ব্যর্থতার অন্তরালে তিনি অনুভব করেছেন এক অন্ধ নির্মম শক্তিকে।"[১৮] পূর্বেই বলা হয়েছে জগদীশ গুপ্ত বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশিষ্ট রচনাভঙ্গি দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হননি নরেন্দ্রনাথ মিত্র। যদিও সরোজমোহন মিত্র লেখেন — "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ', 'মহাকালের জটার জট', 'রাঘব মালাকার', 'উপায়', 'কালোবাজারে প্রেমের দর' প্রভৃতি একের পর এক গল্পে আমাদের চেতনা এবং অনুভবকেই সমূলে প্রচণ্ড নাড়া দিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজের বহু নগ্ন বাস্তবতা, নির্মম জীবনবোধ, শূন্যগর্ভ আভিজাত্য ও বিশ্বাস এমনভাবে ধরা পড়ল যাতে জীবনকে দেখার দৃষ্টিই পরিবর্তিত হয়ে গেল। এমন নির্মোহ অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাজ বাস্তবকে তাঁর পূর্বে আর

কেউ প্রত্যক্ষ করেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজ, পরিবার, প্রেম, ধর্ম, ভক্তি, বিশ্বাস, সংস্কার, সমস্ত কিছুকে দেখবার প্রকৃতিই পরিবর্তিত হয়ে গেল। মানিকের 'কেন' রোগ যেন সকলকে পেয়ে বসল। স্বাভাবিক ভাবে চল্লিশের দশকের গল্প লেখকদের উপর মানিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল অপরিসীম।"[১৯] নরেন্দ্রনাথেরও আর্বিভাব চল্লিশের দশকে এবং তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপরিসীম প্রভাব থেকে বহুলাংশে মুক্ত। মনে হয় তাঁর সময়ের অন্যান্য গল্পকারদের থেকে নরেন্দ্রনাথ যে বিশিষ্ট তা প্রমাণে আলোচকের উপরোক্ত বক্তব্যটিকেও পরোক্ষ ভাবে কাজে লাগানো যায়।

বস্তুত যে বিক্ষুব্ধ জীবন জিজ্ঞাসা তিরিশের দশকে জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল ও তাঁদের রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছিল, সেই বিক্ষুব্ধ জীবনজিজ্ঞাসা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় আরও তীব্র ও ভয়াবহ আকার লাভ করেছিল। সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক প্রকৃতির পরিবর্তন, মূল্যবোধের ভাঙন প্রভৃতি মানবজীবনে এক নগ্ন বিকারের জন্ম দিয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যভাবে নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে সাহিত্য রচনা করলেও এই বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রভাব ও এই সময়ের অন্যান্য রচনাকারদের প্রভাব তাঁর রচনায় খুবই কম। নরেন্দ্রনাথ নিজেও এই বিষয়ে সচেতন — "এই মুহূর্তে পৃথিবীতে ঘটনার স্রোত বয়ে চলেছে। যুদ্ধ, হত্যা, কত দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তন। সব খবরের কাগজে পড়ে যাই বড় বড় ছাপার অক্ষরে, কিন্তু মনে কোন ছাপ পড়ে না। সে সব দূরবর্তী দেশের কথা, চোখের আড়ালে যেখানে, ঘটনা তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে তার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমার চোখের সামনে, আমার চারপাশেও তো কত ছোট ছোট ঘটনার ঢেউ উঠেছে। সে সম্বন্ধেও তো কোন সচেতনতা নেই।"[২০]

এইভাবে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের রচনায় তাঁর পূর্বসূরীদের প্রভাব অত্যন্ত স্বল্প বা অনেকক্ষেত্রে নেই। বাংলা ছোট গল্পের প্রাঙ্গনে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে এই অধ্যায়ে ইতিপূর্বে তাঁর অতি নিকটবর্তী পূর্বসূরীদের কিছু পরিচয় নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন নরেন্দ্রনাথের একান্ত সমসাময়িক কয়েকজন সাহিত্যসঙ্গীর পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। নরেন্দ্রনাথের একান্ত সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৩), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এবং সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)।

পূর্বে উল্লেখিত লেখকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তের মানসিকতা ও রচনাভঙ্গির সঙ্গে সুবোধ ঘোষের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। এই তিন কথাসাহিত্যিকের সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে আলোচক বলেন — ".... জগদীশ, মানিক ও সুবোধ — তিন কথাসাহিত্যিকই নিরাসক্ত দৃষ্টিতে, পরিবেশ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন থেকে জীবনের জটিলতা ও রহস্যময়তার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। চরিত্রের প্রতি ছিলেন

পক্ষপাতশূন্য এবং আবেগ বিষয়ে ছিলেন নির্বিকার।"[২১] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুবোধ ঘোষের এই সাদৃশ্যের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সুস্পষ্ট আশাবাদ এবং গান্ধীবাদ ও সনাতন ভারতীয়ত্বে আস্থার দিক থেকে সুবোধ ঘোষ ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে অনেক দূরবর্তী লেখক। প্রকৃত পক্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষ উভয়েই ছিলেন চল্লিশের দশকের গল্পকারদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী লেখক। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এই দুজনকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ এবং নরেন্দ্র মিত্রের পূর্বসূরী হিসেবে উল্লেখ ক'রে বলেন — "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবোধ ঘোষের দক্ষতাকে উত্তরাধিকার হিসেবে নিয়েই চল্লিশ দশকে এসেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র।"[২২] তার এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট যে সুবোধ ঘোষের মত শক্তিশালী লেখক শুধুমাত্র পরবর্তী গল্পকারদেরই নন সমসাময়িক গল্পকারদেরও প্রভাবিত করেছিলেন। সুবোধ ঘোষের প্রভাব বা উত্তরাধিকার নরেন্দ্রনাথ মিত্র কতখানি বহন করেছেন তা যথাসময়ে আলোচিত হবে। এখন দেখা যাক সুবোধ ঘোষের বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রবণতাটি কোন দিকে।

'অযান্ত্রিক' গল্প প্রকাশের (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক দোল সংখ্যা, ১৯৪০) মধ্য দিয়ে সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের জগতে আর্বিভাব। রিয়ালিজমের এক নতুন রূপ নিয়ে সাহিত্য জগতে তাঁর আর্বিভাব, তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য "গভীর অর্থনীতিক ও রাজনীতিক চেতনা, প্রখর বাস্তবজ্ঞান ও অভ্রান্ত জীবনবোধ" [২৩] সুবোধ ঘোষের ছোট গল্পের সংখ্যা ১৫৭টি। এই গল্পগুলির মধ্যে 'অযান্ত্রিক', 'ফসিল', 'গোত্রান্তর', 'সুন্দরম্', 'পরশুরামের কুঠার', 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' ইত্যাদি সুবিখ্যাত। তিনি তাঁর ছোটগল্পে যেমন ভাবে মধ্যবিত্ত মানুষের ভণ্ডামি, আত্মপ্রতারণা, ভীরুতা, নীচতা, হীনতা ও সুবিধাবাদী মানসিকতা প্রকাশ করেছেন তা তুলনারহিত। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনবিশ্লেষণ।

সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার বিষয়গত বৈচিত্র্য। তাঁর রচিত গল্পগুলির বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি এমন সব বিষয় ও এমন এক জগতকে আমাদের সামনে তুলে এনেছেন যা এরপূর্বে বাংলা ছোট গল্পের জগতে দেখা যায়নি। এক 'যন্ত্রপশু'র সঙ্গে মানুষের আত্মিক সম্পর্কের দিকটি ফুটে উঠেছে 'অযান্ত্রিক' গল্পে। যন্ত্রের সঙ্গে মানবের বিচ্ছেদের ট্র্যাজেডি গল্পের মূল যা একই সঙ্গে অর্থনৈতিক সঙ্কটের উপর নির্ভরশীল। 'ফসিল' গল্পে অঞ্জনগড়ের অভ্রখনির পটভূমিকায় তিনি রচনা করেছেন সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও শ্রমজীবি শ্রেণির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামকে। অর্থনীতিকে গভীরভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তুলে এনেছেন তিনি এই গল্পে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মপ্রতারণা, অসার দম্ভ ও আভিজাত্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'সুন্দরম', 'গোত্রান্তর' , 'উচলে চড়িনু', 'পরশুরামের কুঠার' প্রভৃতি গল্পে। এই সব গল্পে তিনি কখনো দেখান যে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কেমন করে অর্থনৈতিক চাহিদা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ('গোত্রান্তর'), আবার কখনো দেখান এই শ্রেণির আপাত নীতিবোধের আড়ালে কেমন করে

প্রকাশিত হয় চরম দেহকামনা ও লোলুপতা ('সুন্দরম')। 'পরশুরামের কুঠার' গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাবাদী মানসিকতা এক সময়ে স্তন্যদানকারীকে কেমন করে বারবণিতায় রূপান্তরিত করে। এদের পাশাপাশি 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ' গল্পে দেখা যায় ধর্মকে অবলম্বন করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের প্রসারণ ও আদিবাসী মানুষের জীবনযন্ত্রণার দিকটি।

অসামান্য ভাষাভঙ্গী, অনন্য শিল্পচাতুর্য ও সমাজ চেতনার প্রাখর্যে সুবোধ ঘোষ আমাদের পরিচিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির অজানা মানসিকতাকে যেমন নিপুণভাবে ব্যবচ্ছেদ করেছেন তেমনি অপরিচিত জনসমাজকেও পরিচিত করবার প্রয়াস করেছেন। আদিবাসী সমাজ ও পরিচিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি উভয়ের নিপুণ রূপকার হিসেবেই তিনি অসামান্য। এই ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের তুলনা করলে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথের রচনায় অপরিচিত জনসমাজ বিশেষ উঠে আসেনি, বরং তিনি চেয়েছেন "পরিচিতদের সুপরিচিত করতে।"[২৪]

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমসাময়িক আর এক গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'খেলনা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে। 'প্রখর ইন্দ্রিয়চেতনা' এবং 'প্রকৃতি ব্যবহারের অভিনবত্ব'— এই দুটি বৈশিষ্ট্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প পর্যালোচনা করলে উপলব্ধি করা যায়। যে ভাবে তিনি প্রকৃতিকে তাঁর গল্পে ব্যবহার করেছেন তা বাংলা ছোটগল্পের জগতে অভিনব। এই প্রকৃতিচেতনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতিচেতনা নয়, এই প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে যৌনচেতনা। প্রকৃতিচেতনার সঙ্গে অন্বিত যৌনচেতনাযুক্ত যে অভিনব রচনা তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে 'নদী ও নারী', 'সমুদ্র', 'মীরার দুপুর', 'বনের রাজা', 'গিরগিটি', প্রভৃতি গল্পে। শুধুমাত্র নরেন্দ্রনাথ নয় সমকালীন অন্যান্য সকল গল্পকারদের থেকেই এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি কালসচেতন নন, রাজনীতি ও সমাজনীতির সম্পর্কেও তাঁর সচেতনতা কিছুটা কম। শুধু তাই নয় তিনি তথাকথিত বাস্তববাদী লেখকও নন, তাই বলে ভাববিলাসিতাও তাঁর গল্পের প্রধান লক্ষণ নয়। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন — "আসলে তিনি অন্তর্লোক - উন্মোচনকারী শিল্পী, সৌন্দর্যবাদী। সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা ও ব্যক্তি নিরপেক্ষতায় তাঁর আগ্রহ আছে।"[২৫] অপরদিকে সরাজমোহন মিত্র বলেন — "তিনি এক অন্তর্মুখী নিঃসঙ্গ শিল্পী। আপন খেয়ালে এই জগৎ ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন, তার সৌন্দর্যকে অনুভব করেন এবং আধুনিক কবির মত তাকে অন্তর্মুখী করেই প্রকাশ করেন।"[২৬] জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পর্কে আলোচকের এই মন্তব্য থেকেই উপলব্ধি হয় যে তাঁর ছোট গল্পের বিষয় ও রীতি স্বতন্ত্র ও অভিনব। তাঁর গল্পে কাহিনিভাগ স্বল্প বরং অনুভব গভীরতাই প্রধান।

পূর্বেই বলা হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সমকালীন লেখকদের বা ছোটগল্পকারদের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য বর্তমান তবুও বলা যায় একটি স্থানে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে আর সেই মিলটি

হল এই যে উভয়েই নাগরিক জীবনের কথাকার আর এই নাগরিকেরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির। নরেন্দ্রনাথের রচনায় গ্রামজীবন ও গ্রামীণ চরিত্রও প্রচুর উঠে এসেছে কিন্তু তাঁর পরের দিকের রচনাসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহর কলকাতার নগর জীবনের চিত্রই প্রধান। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র উভয়েই নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিত্রাঙ্কন করলেও উভয়ের রচনার মিল শুধু ঐটুকুই। প্রকৃতি ও সৌন্দর্যচেতনা ব্যতীত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে মানুষগুলিকে রচনা করেন তারা সকলেই বিপন্ন, বিপর্যস্ত, অবক্ষয়িত সমাজের মানুষ, যারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নেমে কেবলই আরো বিপর্যস্ত ও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ রচনা করেন মানুষের উত্তরণের কাহিনি; সর্বনাশের শেষ সীমাতে এসেও যেখানে মানুষ ঘুরে দাঁড়ায় আলোর দিকে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মানুষের অন্তঃশীল সংঘাত ও সংকটই ব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব ছিল ছাত্রাবস্থা থেকেই। ফরিদপুরে তাঁরা উভয়েই এক কলেজে পড়তেন এবং সেখান থেকেই তাদের সখ্য গড়ে উঠে। নরেন্দ্রনাথের ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের রচনা থেকে জানা যায় যে নরেন্দ্রনাথ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শুধু ঘনিষ্ঠতা নয় তাদের টেম্পারামেন্টেরও মিল ছিল। ধীরেন্দ্রনাথ লেখেন — "ফরিদপুরে কলেজেই নারায়ণ গাঙ্গুলির সঙ্গে দাদার আলাপ। নারায়ণ ফরিদপুরে এক বছর আই এ পড়েছিল। একবার ছুটিতে আমাদের বাড়িতে একমাস কাটিয়ে এসেছিল।... কলেজে দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল নারায়ণ। নারায়ণের সঙ্গে দাদার মেজাজের মিল ছিল।"[২৭] এম এ-তে ভর্তি হয়েও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একই সঙ্গে কলকাতায় শোভাবাজারের মেসে থাকতেন এবং একই সঙ্গে লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার লড়াইয়ে সঙ্গী হয়েছিলেন।

যদিও ধীরেন্দ্রনাথ লেখেন নরেন্দ্রনাথ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মেজাজের মিল ছিল' তথাপি এই মিল তাদের রচনায় খুব বেশি দেখা যায় না। বীভৎস ও অদ্ভুত রস এবং ভয়ানক মর্মান্তিক পরিস্থিতি ও পরিবেশ রচনার দিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে বিশেষ প্রবণতা তার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কোনো মিল নেই। রোম্যান্টিক উদ্দাম কল্পনা ও কাব্যপ্রাণতা তাঁর গল্পের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য। 'বীতংস', 'টোপ', 'পুষ্করা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে কখনও প্রকাশিত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক হিংস্রতা, যেখানে রাজকীয় ব্যাঘ্র শিকারের আয়োজনে টোপ হিসেবে মানবশিশুকে ব্যবহার করা হয় ('টোপ'), আবার কখনও প্রকট হয়ে উঠেছে মন্বন্তরের সময়ের বস্ত্রসঙ্কটের তীব্রতা ('দুঃশাসন')। 'হাড়' গল্পটিতে দেখা যায় কেমন করে সভ্যতাগর্বী বিকারগ্রস্ত এক রায়বাহাদুর দুর্ভিক্ষের দিনে সম্পূর্ণ বিকারহীন থাকেন, নিজের বিবেক ও মানবিকতার দরজাকে অবরুদ্ধ রাখেন। রায়বাহাদুরের মধ্যদিয়ে সমগ্র বিত্তবান অভিজাত শ্রেণির সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে। 'ভাঙ্গা চশমা' গল্পে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন, যে দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করা

সম্ভব ছিল তা কেমন করে প্রশাসনের অবহেলায় ও কালোবাজারিদের চক্রান্তে ভয়াবহ আকার ধারণ করে আর কেমন ভাবে তা এক নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী শিক্ষকের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেয়। 'পুষ্কর' গল্পেও দুর্ভিক্ষ তার ভয়াবহতা এক ভিন্ন মাত্রা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। 'বীতংস' গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। আসামের চা বাগানের কুলি সংগ্রহের দালাল সুন্দরলাল নিরীহ সাঁওতালদের বিশ্বাস অর্জন করে তাদের সরল বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে তাদের চা বাগানের কুলিতে পরিণত করবার জন্য নিয়ে যায়। গল্পের পটভূমি ও পরিবেশ রচনার ক্ষেত্রে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচিত্র ও প্রচুর অভিজ্ঞতার দিকটি ক্রিয়াশীল। এই গল্পগুলি ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গল্পে তিনি পরিচয় দিয়েছেন প্রখর কাল সচেতনতার, প্রবল পৌরুষ ও তীক্ষ্ণ সমাজ সচেতনতার। বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, বিক্ষোভ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত একটি কালকে তিনি সময় সচেতন গল্পকারের মতন তুলে ধরেছেন। এই প্রখর কালসচেতনতা ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও শানিত বিদ্রূপের ভঙ্গিটি তাঁর বন্ধু ও একসময়ের 'রুমমেট' নরেন্দ্রনাথের মধ্যে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

এতক্ষণ পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথের সমকালীন সাহিত্যসঙ্গীদের যে পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করা হল তাঁরা সকলেই বিক্ষুব্ধ সময়ের লেখক। এই লেখকদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও বৈসাদৃশ্যই যেন চোখে পড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গেই তাঁর সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মিল যেন খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপায়ণে উভয়েই সমধর্মী বলে চিহ্নিত হতে পারেন।

নরেন্দ্রনাথের মত সন্তোষকুমারও ছিলেন ফরিদপুর জেলায়। নরেন্দ্রনাথ যেমন বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেন ভাঙ্গা ও সদরদিতে, তেমনি জন্মের (১৯২০) পর ষোল বছর পর্যন্ত সন্তোষকুমারও অতিবাহিত করেন ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ি নামে মহকুমা শহরে। শুধু এই সাদৃশ্য নয় নরেন্দ্রনাথের মত সন্তোষকুমারও পরবর্তীকালে (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে) কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চলে আসেন। ব্যক্তিজীবনের এই সাদৃশ্য ব্যতীত উভয়ের রচনাগত দিকের সাদৃশ্য অনুসন্ধানই আমাদের উদ্দেশ্য। ১৯৩৭ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় সন্তোষকুমারের প্রথম গল্প 'বিলাতী ডাক' প্রকাশিত হয়, 'তারাশঙ্করের 'ছলনাময়ী' গল্প পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্তোষকুমার এই গল্পটি লেখেন।(সূত্র — অলোক চক্রবর্তী ঃ 'সন্তোষকুমার ঘোষ ঃ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক', পুস্তক বিপণি,কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অক্টোবর, ২০০১, পৃষ্ঠা — ১৩৩)। গ্রামীণ পটভূমিকায় তিনটি দিনের আশ্রয়ে লেখক বহুচরিত্রকে উপস্থাপন করেছেন এই গল্পে। যে সামাজিক সংবেদনশীলতার ধর্মে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে সন্তোষকুমারের সাদৃশ্য আমরা অনুভব করি সেই সামাজিক সংবেদনশীলতার পরিচয় প্রথম গল্প থেকেই পাওয়া যায় । আলোচক সন্তোষকুমারের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন — "কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের অকিঞ্চিৎকরতার

নির্মোহ চিত্রায়ণে তিনি নিপুণ। তাঁর গল্পের ভিতরে বক্তব্য স্পষ্ট রেখায়িত। আসলে বক্তব্যটাই আগে আসে, তাকে ঘিরে গল্পের ঠাস বুনন। নেই প্লটের প্রতি ঝোঁক, নেই টানা গল্প রচনার আগ্রহ। আছে পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি, আর ভাষার উজ্জ্বল প্রসাধন।"[২৮] এছাড়া তাঁর রচনার আর একটি দিক হল আত্মজৈবনিকতা। নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন রূপায়ণের পরিচয় যে গল্পগুলিতে ফুটে উঠেছে সে গুলির মধ্যে 'যাদুঘর', 'একমেব', 'দ্বিজ', 'কানাকড়ি', 'কস্তুরীমৃগ' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায় আর আত্মজৈবনিকতার সুর ফুটে উঠেছে 'শোক', 'চিররূপা', 'জীয়ন কাঠি' প্রভৃতি গল্পে। যুদ্ধোত্তর কালের সামাজিক বিপর্যয়ের চিত্র তাঁর গল্পে আছে, দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই-এ পরাস্ত, ধীরে ধীরে নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষের চিত্র আছে কিন্তু সেই বর্ণনায় অতিরঞ্জন নেই, বীভৎসতা নেই, বর্ণনায় নির্মমতা আছে কিন্তু একই সঙ্গে সুগভীর মমতা ও করুণাও আছে। এই দিকটি দিয়ে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য।

এই অধ্যায়ে নরেন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ছোটগল্পকারদের কিছু কিছু পরিচয় নেবার এবং তাঁদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের কিছু ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন নরেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে, তাঁর বিশেষত্বের দিকটিকে নির্দেশ করে বাংলা ছোটগল্পের জগতে তাঁর স্থানটিকে নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রনাথের আবির্ভাব কালটিকে প্রথম অধ্যায়ে কিছুটা ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের সমকালকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনি নিজে এক বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রতিনিধি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা মুহূর্তে তাঁর ছোটগল্প জগতে আবির্ভাব আর সেই সময়টি ছিল এক উদ্‌ভ্রান্ত পালাবদলের কাল। প্রচলিত নিয়মনীতির, মূল্যবোধ ও নীতিবোধের বিপর্যয়ের, পারিবারিক ও সামাজিক এক ভাঙনের কাল ছিল সেটি। তাঁর সমসাময়িক প্রায় সকল গল্পকারই সেই বিক্ষুব্ধভাবকে আশ্রয় করেই সাহিত্য জগতে পদার্পণ করেছেন, কিন্তু লক্ষ করার বিষয় যে প্রচলিত সাহিত্যস্রোতধারা থেকে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অনেকটাই দূরবর্তী। বিক্ষুব্ধ সময়ের লেখক হয়েও তিনি স্থিতধী, শান্ত ও সংযত। তিনি মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত মানুষদেরকে নিয়েই তাঁর ছোটগল্প রচনা করেছেন, কিন্তু এই মানুষদের সমসাময়িক সকল গল্পকারই তাঁদের রচনায় স্থান দিয়েছেন এবং এটি সেই সময়ের গল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এই একই বিষয়ে নিয়ে গল্প রচনা করলেও সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান, আর এই পার্থক্য মমতার-সহমর্মিতার। আলোচক এই প্রসঙ্গে বলেন — "সমসাময়িক লেখকরা যখন নির্মম হাতে মধ্যবিত্ত বিবেকের ব্যবচ্ছেদ করেছেন, নির্মোহ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সকল রকম ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, কঠিন সময়কে ততোধিক কঠিন ধিক্কারে জর্জরিত করে সাহিত্যে তুলে এনেছেন, সেখানে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের বড় রকমের ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। মধ্যবিত্ত বিবেকের কাঁটাছেড়া নরেন্দ্রনাথও করেছেন। কিন্তু এই মানুষের পাপের কথায় পঞ্চমুখ তিনি হতে পারেননি, তাদের

পদস্খলনের চিত্র আঁকার সময় অন্যদের মত নির্মম হতে পারেন নি নরেন্দ্রনাথ। বরং বেদনাহত চিত্তে তাদের সহমর্মী হয়েছেন।"[২৯] এই সমবেদনা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রেই নরেন্দ্রনাথ বিশিষ্ট হয়ে পড়েন। তাই আমরা দেখতে পাই, সর্বনাশের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়েও মানুষ ফিরে আসে, পতনোন্মুখ হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানবাত্মার জয়কেই ঘোষণা করে। নরেন্দ্রনাথের গল্পে এই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও সেগুলিতে বাস্তবতার হানি ঘটেনি, যেখানে প্রয়োজন সেখানে অনেক নির্মম, নিরাবরণ বর্ণনা আছে, কিন্তু পাপ বা স্খলন পতনের ত্রুটির বর্ণনা তাঁর গল্পের প্রধান লক্ষণ নয়। তাই 'রসাভাস' গল্পে দেখি নারীমাংস লোলুপ মুকুন্দ ভাঙনের শেষ সীমায় এসে দাঁড়ালেও মনুষ্যত্ববোধ তার মরে যায়নি। বরং তার মধ্যে সহসা মনুষ্যত্ববোধের জাগরণ ঘটেছে, আকস্মিক আঘাতে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে সে, সোহাগীকে ভোগের বাসনা ছিল তার অন্তরে, কিন্তু যখন সে দেখে নিজের আপন মাসি হওয়া সত্ত্বেও পদ্মমণি সোহাগিকে মুকুন্দের ভোগের সামগ্রী হতে দিতে বিন্দুমাত্র অরাজি নয়, বরং সানন্দে সহায়তা করতে ও হাতপেতে অর্থ উপার্জনের জন্য উদ্‌গ্রীব, তখন পদ্মমণির নির্লজ্জ ব্যবহার ও অমানবিকতায় স্তম্ভিত হয়েছে গেছে মুকুন্দ,তার নিজের স্খলন- পতন-ত্রুটিকে সে যেন সহসা উপলব্ধি করেছে। পদ্মমণির নির্লজ্জ বাক্যালাপ, লোভ ও রসিকতায় অস্থির হয়ে পদ্মমণিকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে সে, নিজেও আহত পশুর মত পালিয়ে গিয়ে যেন নিজের কাছে নিজেকে ছোট হবার থেকে বাঁচাতে চেয়েছে।

মানুষের মনুষ্যত্বের অবক্ষয়ের চূড়ান্ত রূপ পরিলক্ষিত হয় 'পুনশ্চ' গল্পেও। গ্রাম্য তাঁতি জৈনুদ্দিন তার খদ্দেরদের জন্য নারী সংগ্রহের ঘৃণ্য বৃত্তি গ্রহণ করেছে। এর পেছনে অবশ্য কারণ ছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দাদা মৈনুদ্দিনের বিধবা ফতেমাকে বিয়ে করেছিল জৈনুদ্দিন, কিন্তু দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে একদিন ফতেমাকে ত্যাগ করে সে, আর ফতেমাও ক্ষুধার জ্বালায় অবস্থাপন্ন আবদুল খাঁয়ের শরণাপন্ন হয়। পরিণামে শহরের পতিতালয়ে স্থান হয় ফতেমার। সময়ের পরিবর্তনে একদিন জৈনুদ্দিনকেই তাঁর পূর্বের স্ত্রী ফতেমার জন্য খদ্দের ধরে এনে জীবিকা অর্জন করতে হয়। মনুষ্যত্বের এই চরম অবক্ষয়ের গল্পেও দেখা যায় শেষ পর্যন্ত জৈনুদ্দিন ও ফতেমা উভয়েই নিজেদের পাপজীবনকে পরিত্যাগ করে সুস্থজীবনে ফিরে আসার জন্য প্রয়াসী, পুনরায় নিজেদের ঘর বাঁধতে আগ্রহী। এভাবেই অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমাতে এসেও মানুষের শুভবুদ্ধি, মানবিকবোধের জয় ঘোষিত হয় নরেন্দ্রনাথের গল্পে।

শুভবুদ্ধির জয় বিষয়টি নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর সমসাময়িক লেখকেরা অনেকাংশেই ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গল্প রচনা করেছেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের ফ্রয়েডপ্রভাবিত গল্প বিশেষ নেই। তিনি নিজে 'সংসার', 'জরা' ও 'যযাতি'- কে বিকৃত বা পরোক্ষ যৌনভোগের গল্প বলে উল্লেখ ক'রে ফ্রয়েডের কোনো কোনো সূত্রের নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে 'যযাতি' গল্পকে ফ্রয়েডপ্রভাবিত বললেও এই প্রভাব কেবলমাত্র গল্পের শেষ

পরিচ্ছেদেই ব্যক্ত হয়েছে অবশ্য এই শেষ পরিচ্ছেদেই গল্পের রসনিষ্পত্তি। দেহ উপভোগের বাসনা অথচ শক্তিহীনতা, মানুষের মনের এই হতাশার বহিঃপ্রকাশই যেন রয়েছে গল্পে। এই প্রসঙ্গে গল্পের শেষ পরিচ্ছেদটি উদ্ধার করা যেতে পারে — "হিমানীর কালো, মোটা, মন্থর গতিতে অপসৃয়মাণ শরীরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ভুবনবাবুর নিজেকে অত্যন্ত বঞ্চিত মনে হয়। তিনি যেন উপবাসী রয়ে গেছেন, বুভুক্ষু রয়ে গেছেন, যৌবনে যেন তিনি কোনোদিন কিছু উপভোগ করেননি। অলক্ষ্যে কখন প্রৌঢ়ত্ব এসে পড়েছে। আর সম্পূর্ণ বুড়ো হবার আগেই এল দুর্দৈব পঙ্গুত্ব। এই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শময় পৃথিবী তার কাছে যেন অনাস্বাদিত রয়ে গেল। বিগত দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনের দিনগুলির মধ্যে একটি উদ্বেল রঙীন মুহূর্তের কথাও আজ তাঁর মনে পড়ল না। বিশ বছর যেন একটানা কেবল একটা অভ্যাসের মধ্যে কেটেছে। নিতান্তই একটা শারীরিক অভ্যাস, আর কিছু নয়।" এই প্রসঙ্গে বলা যায় 'যযাতি' গল্পটি রচিত হয়েছে ফাল্গুন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে, তবে এই একই নামে নরেন্দ্রনাথের আরেকটি গল্প রয়েছে, তার রচনাকাল আশ্বিন, ১৩৬৬ তারিখে। এই দ্বিতীয় 'যযাতি' গল্পেও প্রায় বৃদ্ধ দম্পতির শারীরিক সক্ষমতার প্রসঙ্গ রয়েছে। যেমন — "এই ষাট বছর বয়সেও তিনি যতখানি সজীব আর সচল বাসন্তী তা নেই। বাসন্তী যেন অনেক আগেই বুড়িয়ে গেছে। কুড়িতে না হলেও চল্লিশে তো বটেই। চল্লিশের পর থেকে বাসন্তী শুধু গৃহিণী আর সচিব। সখী নয়। ললিতকলায় শিষ্যত্বগ্রহণেরও কোন আগ্রহ নেই।... তাতে অবশ্য দুঃখ নেই পঞ্চাননের।"

ফ্রয়েড ব্যতীত অন্য যার দ্বারা লেখকেরা প্রভাবিত হয়ে গল্প রচনা করেছেন তিনি হলেন কার্ল মার্কস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প এবং সমরেশ বসুর প্রথম দিকের গল্প যে ভাবে মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত নরেন্দ্রনাথের গল্পে মার্কসবাদের সেরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' বা 'হারানোর নাতজামাই' কিংবা সমরেশ বসুর 'কিমলিস'-এর সমগোত্রীয় গল্প নরেন্দ্রনাথের রচনায় পাওয়া যায় না, তবে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও রাজনীতি প্রভাবিত গল্প নরেন্দ্রনাথ বেশ কিছু লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে 'পতাকা', 'বিষাদযোগ' 'অপঘাত' প্রভৃতি গল্পের নাম উল্লেখ করা যায়। মার্কসবাদ বা অন্য কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা গল্প রচনার ক্ষেত্রে উৎসহিত না হলেও কাল সচেতন শক্তিশালী লেখক নরেন্দ্রনাথ খাদ্যসংকট ও বস্ত্র সংকটকে নিয়ে গল্প রচনা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ 'মদনভস্ম' (খাদ্য সংকটের চিত্র) এবং 'আবরণ' (বস্ত্র সংকটের চিত্র) গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়।

নরেন্দ্রনাথের গল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে তাঁর গল্পে শত অনাচার ও বীভৎসতার মধ্যেও মানুষের ন্যায়বোধ নিঃশেষ হয়ে যায়না, কল্যাণময় ও সুন্দরের শান্তিময় বাতাবরণ সেখানে বিরাজ করে। একথা সর্বতোভাবে সঠিক হলেও যেখানে প্রয়োজন সেখানে নিরাবরণ বর্ণনা ও সত্যের নগ্ন প্রকাশও

নরেন্দ্রনাথের রচনায় আছে। অতএব তাঁকে ভালোত্ববাদী দার্শনিক উপাধিতে ভূষিত করা যায়না। তবে একথাও সত্য যে অনাবশ্যকভাবে বা ইচ্ছাকৃত ভাবে পঙ্কিল বর্ণনা দ্বারা তাঁর রচনাকে তিনি আবিল করেননি। যে লেখক 'রসাভাস' গল্পে দেখান যে, অর্থলালসার বিকৃতরূপ দেখে, মাসি- বোনঝির সম্পর্ককে কলুষিত হতে দেখে মুকুন্দের পাপ ও নারী মাংস লোলুপতা বিলীন হয়ে গেছে, তিনিই 'মদনভস্ম' গল্পে দেখান যে দুঃসহ ক্ষুধার আগুনে দয়া, মায়া, স্নেহ, ভালোবাসা ও উদগ্রকামনা বাসনাও কেমন করে নিঃশেষ হয়ে যায়। কেবলমাত্র 'ভালোবাসার গল্পে'র লেখক নরেন্দ্রনাথ জৈবিক প্রবৃত্তির যে নগ্ন ভয়ংকর রূপকে 'মদনভস্ম' গল্পে ফুটিয়ে তোলেন সেটি তাঁর সমসাময়িক লেখকদের রচনায় উপস্থাপিত ভয়াবহ বর্ণনা থেকে কম ভয়ংকর নয়। এই গল্পে নরেন্দ্রনাথ দেখান যে ধনঞ্জয় ধুপীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মালতী অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে ভাগ্নে মানিকের সঙ্গে। কঞ্চির প্রহার, তিরস্কার, ভর্ৎসনাও মালতীকে তার দুর্বার বাসনা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। কিন্তু ক্ষুধার আগুনে সেই কামনা নিঃশেষ হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র ক্ষুধার জ্বালাকেই অবশিষ্ট রেখেছে। এই বিষয়টিকে যেমন ভাবে কঠোর বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তাঁর ভালোত্ববাদী রচনাকারের তকমা ঘুচে যায়, বরং এক শক্তিশালী লেখকের বাস্তবনিষ্ঠাকেই তুলে ধরে। তাই বলা যায় 'শান্ত মধুর ভাব' তাঁর রচনায় বেশি, কিন্তু সমাজের শঠতা, ক্রুরতা ও বীভৎস দিকের পরিচয় তাঁর রচনায় কম কিন্তু একেবারেই নেই তা নয়। এর কারণ এই যে, তাঁর মেজাজ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয় তাই তাঁর রচনার প্রবণতাও সেইদিকে। এ তাঁর দুর্বলতা নয়, বরং বিশিষ্টতা; যা তাঁকে সমসাময়িক গল্পকারদের থেকে পৃথক করেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, তাঁর গল্পের পরিবেশ ও চরিত্রগুলি আমাদের খুব চেনা ও আমাদের আশেপাশে যেন এমন চরিত্র আমরা প্রত্যহই দেখতে পাই। তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচকদের অভিযোগ এই যে, গল্প রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেন খুব নির্দিষ্ট একটি গন্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করেছেন, সেই পরিচিত মানুষের চেনা গন্ডির বাইরে তাকে খুব একটা বেশি ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়না। একথা অনেকাংশে সত্য কিন্তু তার সঙ্গে এই কথাও সত্য যে পরিচিত যে পরিবেশ ও চরিত্রকে তিনি বর্ণনা করেন তা কিন্তু অতি চেনা হলেও কম আকর্ষণীয় নয় এবং একঘেয়েমির লেশ মাত্র সেখানে নেই। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিচিত জনের জীবনেও যে বহুরহস্য, বহু আকর্ষণ, বহু গল্পের উপাদান আছে তা নরেন্দ্রনাথ আমাদের সামনে সুস্পষ্ট রূপেই প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজের এই প্রবণতা অর্থাৎ আমাদের সুপরিচিত মানুষদের নিয়ে গল্প লেখার বিষয়টি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবহিত ছিলেন এবং নিজের বিভিন্ন রচনায় তা সুস্পষ্টভাবে স্বীকারও করেছেন। 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণে 'বলাবাহুল্য' শিরোনামাঙ্কিত ভূমিকায় তিনি বলেন — "আমার কোন রচনাতেই অপরিচিতদের পরিচিত করবার উৎসাহ নেই। পরিচিতরাই সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।" আবার 'গল্প লেখার গল্প' - এ নরেন্দ্রনাথ

বলেন — "সব লেখকই নিজের চেনাজানা গন্ডির ভিতর থেকে গল্পের উপাদান পেয়ে যান। আমিও তাঁদের ব্যতিক্রম নই। তবে কেউ কেউ বলেন আমার লেখায় সামান্য ছদ্মনামের আড়াল যদি বা থাকে, ছদ্মবেশের আড়ালটুকু থাকে না।" নরেন্দ্রনাথের নিজের এই বক্তব্য থেকে ও তাঁর ছোটগল্পের বিশ্লেষণ করলে তাঁর পরিচিত মানুষদের সুপরিচিত করবার প্রয়াসটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে যে সকল মানুষকে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেই মানুষেরা তারাশঙ্করের পরিচিত অর্থাৎ বীরভূমের গ্রামীণ সমাজের প্রধান জমিদার শ্রেণি এবং তাদের সঙ্গে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি, শৈলজানন্দের পরিচিত মানুষদের মধ্যে আছে কয়লাকুঠিতে বিচরণকারী জনসমাজ কিন্তু নরেন্দ্রনাথের পরিচিত জনের ক্ষেত্রটি পৃথক। নরেন্দ্রনাথের এই পার্থক্য শুধুমাত্র উপরোক্ত দুই গল্পকারের থেকে নয়, তাঁর সমকালীন অন্যান্য অনেক গল্পকারদের থেকেও। সমাজের বৈভবশালী মানুষ, উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ী, অভারতীয় বা অবাঙালি মানুষেরা যেমন নরেন্দ্রনাথের অপরিচিত তেমনি সমাজের একেবারে অন্ত্যজ গোষ্ঠী, কয়লাখনি অঞ্চলের সাঁওতাল, ওঁরাও কুলি কামিন বা 'হিন্দু মসুলমান সাপুড়ে-বেদে-ডাকাত-চাষী-ঠ্যাঙাড়ে, কাহার-বাগদী-ডোম-বাউরি-বীরবংশী' সমাজ ও মানুষও তাঁর কাছে অপরিচিত জন। অভিজ্ঞতা বা পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা যাদের সঙ্গে নেই তাদের নরেন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে তুলে আনার চেষ্টা করেননি। এই কারণে 'চাঁদমিঞা', 'রত্নাবাঈ' ও 'শ্বেতময়ূর' এই তিনটি গল্পে যথাক্রমে চাঁদমিঞা, রত্নাবাঈ ও আবীরচাঁদ-রূপচাঁদ এবং জার্মান যুবক ম্যাকস এই কয়টি চরিত্র ব্যতীত নরেন্দ্রনাথের অন্যান্য সকল গল্পের সকল চরিত্রই বাংলাদেশ ও বাঙালিয়ানার গন্ধ মিশ্রিত। নরেন্দ্রনাথের অপরিচিত জনের খোঁজ নেবার পর তাঁর পরিচিত জনের অন্বেষণ শুরু করা যেতে পারে। তাঁর অপরিচিত জনের সংখ্যা যেমন কম নয় তেমনি তাঁর পরিচিত জনের তালিকাও কম দীর্ঘ নয়। স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে বসবাসের অভিজ্ঞতায় যে সকল মানুষকে তিনি তাঁর গল্পে, বিশেষ করে তাঁর প্রথম দিকের গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন তারা প্রত্যেকেই তাঁর পরিচিত আর এই পরিচিত জনেরা সকলেই পূর্ব বাংলার গ্রামীণ মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও অন্ত্যজ প্রান্তিক শ্রেণির মানুষজন।এদের অর্থনৈতিক শ্রেণি যেমন ভিন্ন তেমনি বৃত্তিগত পার্থক্য বা ভিন্নতাও কম নয়। কৃষাণ, কামলা, ছুতোর, গাছি, মালাকার, মাঝি প্রভৃতি পেশার মানুষদের খুঁজে পাওয়া তাঁর গল্পের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অপরদিকে লেখকের কলকাতাবাসের অভিজ্ঞতালব্ধ গল্পগুলির চরিত্রও মধ্যবিত্ত মানুষ কিন্তু তারা গ্রামীণ নয় বরং নাগরিক। আর লেখকের মত তাদের অনেকেই দেশভাগের শিকার, তাদের জীবিকাও ভিন্ন ও বিচিত্র। তারা কখনও লেখক, গায়ক, শিল্পি, কাঠমিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কেরানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, সাংবাদিক কখনও বা টিউশন শিক্ষক।নরেন্দ্রনাথের গল্পের অন্যতম আকর্ষণের কারণ হয়তো এই যে, তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি আমাদেরও পরিচিত তাই এই চরিত্রগুলি আমাদের বিস্মিত করে না, বরং অধিক মাত্রায় আকর্ষণ করে। তাঁর পরিচিত মানুষেরা আমাদেরও

পরিচিত আর তাঁর রচনার দ্বারা আমরা আরও অধিক পরিমাণে সেই মানুষদের পরিচয় পাই। নরেন্দ্রনাথের রচনার এই বৈশিষ্ট্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাই আলোচক বলেন— "নরেন্দ্রনাথের শক্তির প্রকাশ তাঁর চেনাপরিচিত মানুষের গল্পে। 'পরিচিত'দের 'সুপরিচিত' করানোর অর্থ কী এই ঃ চরিত্রের কিছুটা জানা ছিল লেখকের সাহায্যে তাকে সম্পূর্ণভাবে জানা গেল। অর্থাৎ জানা ছিল 'অর্ধসত্য' ('পরিচিত'), লেখক সেই চরিত্রের 'সম্পূর্ণ সত্য'কে ('সুপরিচিত') উন্মোচিত করলেন।"[৩০] অপরদিকে নরেন্দ্রনাথের একই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণ অন্বেষণ করে অপর আলোচক বলেন— "গল্পের পরিবেশ ও চরিত্রগুলি ছিল খুব চেনা জানা আমাদের চারপাশের আপনজনেরা। এই সহজ গ্রহণযোগ্যতা সর্বস্তরের পাঠকের কাছে নরেন্দ্রনাথকে অত্যন্ত প্রিয় করে তুলেছিল।"[৩১] প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন নরেন্দ্রনাথের গল্পে শিল্পরূপ লাভ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণভাবে যা নিতান্তই গতানুগতিক তার মধ্য থেকেও গল্পের বিষয়কে তুলে এনে তাকে অনায়াস দক্ষতায় অসামান্যতা দিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ।

নরেন্দ্রনাথের রচনার আর একটি বিশেষ দিক হল এই যে, দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে তিনি যত সংখ্যক গল্প রচনা করেছেন সম্ভবত এত সংখ্যক গল্প আর অন্য কোনো লেখক এই বিষয়কে নিয়ে রচনা করেননি। তিনি নিজে ছিলেন ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। যদিও দেশভাগের পূর্ব থেকেই তিনি পূর্ব-পাকিস্তান পরিত্যাগ করে কলকাতাবাসী হয়ে ছিলেন কিন্তু দেশের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট যোগ ছিল, কারণ পরিবারের অন্যান্য সদস্যেরা তখনও পূর্ব- পাকিস্তানেই ছিলেন। ফলে দেশবিভাগের পর হিন্দু জনসমাজের ভারতবর্ষে চলে আসা ও তাদের জীবন সংগ্রামকে যেমন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি দেখেছেন ভিটেমাটি আঁকড়ে ধরে সজল আবেগে জীবনকে তুচ্ছ বিবেচনা করে পুরোনো বাসস্থানেই থেকে যাওয়া মানুষকে, অনুভব করেছেন তাদের বিশিষ্ট মন মানসিকতাকে। ফলে তাঁর ছোটগল্পগুলিতে উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই স্থান পেয়েছে নিজের জন্মস্থানকে পরিত্যাগ করতে না চাওয়া মানুষের কাহিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'পালঙ্ক' গল্পের ধলা কর্তার চরিত্রটি আমাদের কাছে বিশিষ্টতা লাভ করে। দ্বিখণ্ডিত বাংলার বিপর্যস্ত উদ্বাস্তু স্রোত, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা হ্রাস, পুরোনো আমলের সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে না পারার ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতা, নিরপত্তাহীনতা প্রভৃতি বিষয় যেমন তাঁর 'হেডমাস্টার', 'দ্বিচারিণী', 'এক পো দুধ' প্রভৃতি গল্পে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কলকাতা বা ভারতবর্ষে এসে নতুন নাগরিক জীবনের সন্ধান পাবার আলোকে উজ্জ্বল চরিত্রও তাঁর গল্পে আছে ('কাঠগোলাপ'), আবার এই দেশবিভাগের ফলে যে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মেয়েরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বচ্ছলতার খোঁজে জীবিকা উপার্জন করার পথে নেমেছে এবং পুরুষের যোগ্য সহধর্মিণী হবার পথে এগিয়েছে ('অবতরণিকা') এমন চিহ্নও নরেন্দ্রনাথের গল্পে বর্তমান। অতএব এদিক থেকে দেখলে বোঝা যায় দেশভাগের বিষয়টি তাঁর বহু গল্পের পরিবেশ

বা পটভূমি রচনা করেছে আর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের ও পরিবারের উপর এই দেশবিভাগের ভিন্ন ভিন্ন অভিঘাত তিনি তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন যা তাঁর সমসাময়িক রচনাকারদের থেকে তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। এই ভাবে নরেন্দ্রনাথের রচনার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করলে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় আর সেগুলি সূত্রাকারে নিম্নে দেখানো যেতে পারে—

১. নরেন্দ্রনাথ বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা চালিত হয়ে তাঁর ছোটগল্প রচনা করেননি। যদিও প্রগতিশীল শিল্পি ও লেখক সংঘের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল কিন্তু বিশেষ কোনো মতাদর্শ দ্বারা নিজের লেখনীকে তিনি পরিচালিত করেননি বা প্রচারধর্মীতাকে তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য করে তোলেননি। যদিও 'পতাকা', 'অপঘাত', 'শোক', 'বিষাদযোগ' প্রভৃতি কয়েকটি তথাকথিত রাজনৈতিক গল্প তিনি রচনা করেছেন।

২. বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা যেমন নরেন্দ্রনাথ পরিচালিত হননি তেমনি তাঁর সময়কার রচনাকারদের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য, মার্কস ও ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও রচনায় তাঁদের তত্ত্বকে ব্যবহার করা— এই দিকটিও নরেন্দ্রনাথের গল্পে প্রকট নয়।

৩. নরেন্দ্রনাথের রচনার বিষয় মানুষ আর সেই মানুষ বিশেষ কোনো বিশেষত্ব বা অসাধারণত্ব মণ্ডিত নয়। নিছক বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন ও তাদের অন্তর্গূঢ় জীবন কাহিনিই তাঁর উপজীব্য। এই ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর প্রথম দিকের গল্পে পূর্ববাংলার গ্রাম জীবন তার অনুপুঙ্খ বাস্তবতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে আর পরবর্তী পর্যায়ের গল্পে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণি তাদের রক্ত, মাংস, ঘাম ও অশ্রু নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে।

৪. মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষ যেহেতু নরেন্দ্রনাথের রচনার মুখ্য চরিত্র, তাই দেখা যায় তাঁর চিত্রিত চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্রে দ্বিধা জর্জর, চিন্তাধারায় অনেক পরিমাণে স্ববিরোধে আক্রান্ত, একই সঙ্গে প্রগতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার ভিন্নমুখী আকর্ষণ ও বিকর্ষণে ক্ষতবিক্ষত।

৫. এক বিক্ষুব্ধ সময়ে তাঁর সাহিত্য জগতে আর্বিভাব কিন্তু এই বিক্ষুব্ধ সময় ও জীবনের বিক্ষুব্ধ রূপের রূপকার তিনি নন। তাই তাঁর মধ্যে সমকাল চেতনা থাকলেও এই সমকাল চেতনা তাঁর রচনার প্রেক্ষাপট রচনা করেছে, চরিত্রদের প্রভাবিত করেছে কিন্তু গল্পের প্রধান বিষয় হয়ে ওঠেনি।

৬. জীবনের ক্লেদাক্ত ও পঙ্কিল দিক থাকলেও এবং এই দিকগুলি সম্পর্কে তিনি সচেতন থাকলেও নরেন্দ্রনাথের মানসিকতা বা মেজাজ রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার তাই তাঁর রচনাতেও এই রোম্যান্টিক সৌন্দর্যপ্রিয়তার দিকটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। যদিও প্রয়োজনীয় স্থানে জীবনের নিরাবরণ বর্ণনা ও ক্লেদাক্ত দিকের বর্ণনাও তাঁর রচনায় আছে কিন্তু এই বর্ণনা এসেছে প্রয়োজনের খাতিরে কেবলমাত্র বাস্তব

গ্রাহ্যতা দানের আরোপিত প্রয়াসের কারণে নয়।

৭. নরেন্দ্রনাথের রচনায় নারী চরিত্রগুলির একটি বিবর্তন চোখে পড়ে। নারীরা সংসারে স্বচ্ছলতা আনয়নের জন্য কিংবা নিজের স্বাধীনতালাভের প্রয়াসে কর্মক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরেছে। গৃহের নিজস্ব গণ্ডিবদ্ধতাকে অতিক্রম করে বৃহত্তর অঙ্গনে নারীরা পা রেখেছে বা রাখছে এমন চিত্র নরেন্দ্রনাথের রচনায় প্রচুর আর অনেকক্ষেত্রে তাঁর চিত্রিত নারী চরিত্রগুলি তাদের পার্শ্ববর্তী পুরুষ চরিত্রগুলি অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। নারী চরিত্রগুলি কেবল পুরুষের পরিপূরক নয় বরং নিজস্ব শক্তির প্রকাশে উজ্জ্বল।

৮. দেশবিভাগ নরেন্দ্রনাথের রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এই দেশবিভাগ, তার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভুত পরিস্থিতি, উদ্বাস্তু স্রোত ও উদ্বাস্তু মানুষের জীবন সংগ্রাম যেমনভাবে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা নিয়ে তাঁর গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে তা বাংলা ছোটগল্পের জগতে বিরল।

৯. নরেন্দ্রনাথের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে তার রচনার বিষয়গত স্বাতন্ত্র্যের আলোচনা শেষ করব আর সেটি হল, নরেন্দ্রনাথের রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক শুভবুদ্ধির জয় দেখতে পাওয়া যায়। তিনি যখন কোনো জটিল সমস্যার অবতারণা করেন তখন কেবলমাত্র সমস্যার যন্ত্রণাটুকুকেই প্রকাশ করেন না বরং সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির দিকটির দিকেও ইঙ্গিত প্রদান করেন।

নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয় ও চরিত্রের এই সকল বৈশিষ্ট্য ব্যতীত সমসাময়িক রচনাকারদের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতার আর একটি কারণ হল তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি। অত্যন্ত অনায়াস সহজ ভঙ্গিতে, সহজ সরলতায় তিনি তাঁর গল্পকে বলতেন; ভাষাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ ও আঙ্গিকের মধ্যে জটিলতার সঞ্চার করতেন না। তাঁর রচনা যে খুব আঙ্গিকসচেতন তা মনে হয়না আর এই সচেতনার অভাবযুক্ত আঙ্গিকটিই তাঁর বিশেষত্ব, তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী। যেখানে একটা গল্প আছে আর সেই গল্পকে সহজ সরলতায় প্রকাশ করা আছে। গল্পকে প্রথম থেকেই কৌতূহলদ্দীপক করে, নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে ঘটনাকে ভিন্নমুখী করে পাঠককে চমকে দেওয়ার প্রবণতা নরেন্দ্রনাথের নেই বরং তাঁর গল্পে চমকহীন এক উদ্ভাসন আছে যা পাঠকের অন্তরে গল্প পাঠের শেষেও অনেকক্ষণ অনুরণিত হয়। তাঁর 'রস', 'জৈব', 'নাম', 'দীপান্বিতা' এমন অনেক গল্পের কথাই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। নরেন্দ্রনাথের গল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে তাই আলোচক সঙ্গত কারণেই বলেন—"নরেন্দ্রনাথ পাঠের মধ্যে আরও একটি ধারণা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—ঘাসের ওপর শিশির বিন্দুটি আবিষ্কারের মতো গল্পের প্লটের জন্যে দেশ দেশান্তরে পাহাড়ে জঙ্গলে না গিয়েও অবলীলায় ও অনায়াসে খুঁজে পাওয়া যায় সেই জমি যা সাধারণ জীবন যাপনের ঘটনাগুলির মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। শুধু চাই একটি কোমল বুক ও তৃষ্ণার্ত চোখ। নবীন লেখক যখন কোনো প্লটের জন্যে ক্রমশ অস্থির হয়ে ওঠে তখন মনে হয় নরেন্দ্রনাথ পাঠ একান্ত

অনিবার্য। কোনো কাহিনিতে এক নতুন মাত্রা কীভাবে যোগ করা যায় তার সুন্দর নিদর্শন প্রতিটি গল্পেই অসামান্য নৈপুণ্যে উপস্থাপনা করেন তিনি।"[৩২]

নরেন্দ্রনাথ প্রচুর ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর প্রাপ্ত ছোট গল্পের সংখ্যা চারশতেরও উপরে। শুধু তাই নয় তিনি আটত্রিশটি উপন্যাসও রচনা করেছেন, যাদের মধ্যে 'দ্বীপপুঞ্জ', 'চেনামহল', 'সূর্যসাক্ষী', 'তিনদিন তিনরাত্রি', 'দেহমন' প্রভৃতি উপন্যাস অসামান্য জনপ্রিয়তা ও পাঠক- আনুকূল্য লাভ করেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথের সাফল্যের কথা উল্লেখ করেও বলা যায় যে তাঁর প্রতিভার সার্থক প্রকাশ রয়েছে তাঁর ছোটগল্পের মধ্যেই। রচনার পরিমাণ এত অধিক বলে স্বাভাবিক কারণেই একথা বলাই বাহুল্য যে তাঁর সমস্ত গল্পই আঙ্গিক বা রচনারীতির দিক থেকে ত্রুটি মুক্ত নয়, কিন্তু এর সঙ্গে একথাও সত্য যে রচনার অধিক্য সত্ত্বেও তাঁর অধিকাংশ রচনায় তিনি সর্বোচ্চ মান বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই দিকটি অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়। চারশতের উপর ছোটগল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি যে অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন সেই বিষয়টিই তাঁকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। কারণ এত অধিক সংখ্যায় এত ভালোমানের গল্প বাংলা সাহিত্যে প্রায় আর কেউই রচনা করেননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর ছোটগল্প গ্রন্থগুলির তালিকা উল্লেখ করা যেতে পারে — 'অসমতল' (১৩৫২), 'হলদেবাড়ি' (১৩৫৩), 'উল্টোরথ' (১৩৫৩), 'পতাকা' (১৩৫৪), 'চড়াই উৎরাই' (১৩৫৬), 'পাটরাণী' (১৩৫৭), 'শ্রেষ্ঠগল্প' (১৩৫৯), 'কাঠগোলাপ' (১৩৬০), 'অসবর্ণ' (১৩৬১), 'ধূপকাঠি' (১৩৬১), 'মলাটের রঙ' (১৩৬২), 'রূপালী রেখা' (১৩৬৩), 'দীপান্বিতা' (১৩৬৩) , 'ও পাশের দরজা' (১৩৬৩), 'একূল ওকূল' (১৩৬৩), 'বসন্ত পঞ্চম' (১৩৬৪), 'মিশ্ররাগ' (১৩৬৪) 'উত্তরণ' (১৩৬৫), 'পূর্বতনী' (১৩৬৬) 'অঙ্গীকার' (১৩৬৬), 'দেবযানী' (১৩৬৬), 'রূপসজ্জা' (১৩৬৬), 'সভাপর্ব' (১৩৬৬), 'স্বরসন্ধি' (১৩৬৭), 'ময়ূরী' (১৩৬৮), 'বিদ্যুৎলতা' (১৩৬৮), 'পত্রবিলাস' (১৩৬৮), 'মিসেস গ্রীণ' (১৩৬৮), 'বিন্দু বিন্দু'(১৩৬৮), 'একটি ফুলকে ঘিরে' (১৩৬৯), 'বিনি সুতার মালা' (১৩৬৯), 'যাত্রাপথ' (১৩৬৯), 'সুধা হালদার ও সম্প্রদায়' (১৩৬৯), 'অনধিকারিনী' (১৩৬৯), 'রূপলাগি' (১৩৭০), 'চিলেকোঠা' (১৩৭১), 'প্রজাপতির রঙ' (১৩৭২), 'অন্য নয়ন' (১৩৭২), 'বিবাহ বাসর' (১৩৭৩), 'চন্দ্রমল্লিকা' (১৩৭৪), 'সন্ধ্যারাগ' (১৩৭৫), 'সেই পথটুকু' (১৩৭৬), 'অনাগত' (১৩৮২), 'পালঙ্ক' (১৩৮২), 'উদ্যোগপর্ব' (১৩৮২), 'বর্ণবহ্নি' (১৩৮৪), 'বিকালের আলো' (১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ), 'নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান' (১৩৯০), 'গল্পমালা -১' (১৯৮৬খ্রি), 'কিশোর গল্প সমগ্র' (১৩৯৫), 'গল্পমালা -২' (১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ), 'স্রোতস্বতী' (১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ), 'সাধ সুখ স্বপ্ন'(১৯৯০খ্রি), 'এই টুকু বাসা' (১৯৯০ খ্রি), 'গল্পমালা-৩' (১৯৯২খ্রি), 'গল্পমালা-৪' (১৯৯৪ খ্রি), 'গল্পমালা-৫' (১৯৯৭খ্রি), 'গল্পমালা-৬' (২০০১খ্রি), 'গল্পমালা-৭' (২০০৩খ্রি)।

এই সকল গল্পগ্রন্থে সংকলিত অসংখ্য গল্পগুলি কোনো তত্ত্ব বা উদ্দেশ্যমূলকতার দ্বারা ভারাক্রান্ত

নয়, অথচ আমাদের চির পরিচিত মানুষজনের চির পুরাতন অথচ চির নবীন প্রাত্যহিক জীবনের উপস্থাপনায় উজ্জ্বল। নরেন্দ্রনাথের গল্পগুলি যেমন বিভিন্ন বিখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তেমনি রেডিওতেও পঠিত হয়েছে; শুধু তাই নয় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু গল্প বিদেশি ভাষাতেও অনূদিত হয়েছে। তাঁর একাধিক গল্প চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে। যেমন 'অবতরণিকা' গল্পটি অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় 'মহানগর' ছবিটি তৈরি করেন। এছাড়া অগ্রগামী পরিচালিত 'বিলম্বিত লয়', 'হেডমাস্টার' এবং ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রযোজনায় রাজেন তরফদার পরিচালিত 'পালঙ্ক' গল্পের চলচ্চিত্রায়িত হওয়ায় কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শুধু তাই নয় নরেন্দ্রনাথের 'রস' গল্পটি হিন্দিতে 'সত্তদাগর' নামে চিত্ররূপ লাভ করেছে। এই সব গল্পের চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হবার দিকটি গল্পগুলির গুণমানের ঔৎকর্ষকেই সপ্রমাণ করে। এত গল্পগ্রন্থ, চলচ্চিত্রে রূপায়ণ, সমসাময়িক গল্পকারদের স্তুতি ও আলোচকদের আনুকূল্য সত্ত্বেও দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ যে পরিমাণে প্রশংসিত ও আলোচিত হবার যোগ্য, সেই পরিমাণে যেন স্বীকৃতি লাভ করেননি। ১৯৬২ তে আনন্দ পুরস্কার ব্যতীত অন্য বিশেষ কোনো প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও তিনি লাভ করেননি। যদিও সন্তোষকুমার ঘোষ দিব্যেন্দু পালিতকে বলেছিলেন- "একটা কথা লিখে দাও নরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন আমাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো লেখক।" (সূত্র- 'আমার চেনা নরেনদা' ঃ দিব্যেন্দু পালিত। গ্রন্থ- 'প্রসঙ্গঃ নরেন্দ্রনাথ'। সম্পাদনা সমীর বসু। পৃষ্ঠা-২৩)। সমসাময়িক প্রখ্যাত গল্পকারদের কাছে একটি সময়ের 'সবচেয়ে বড়ো লেখক' অভিধায় ভূষিত হয়েও দেখা যায়, যে নরেন্দ্রনাথ অন্য অনেক রচনাকারদের থেকে কম আলোচিত ও পঠিত। এর একটি কারণ হিসেবে বলা যায় — বিজ্ঞাপনের অভাব ও তাঁর গল্পগ্রন্থের দুস্প্রাপ্যতা। আনন্দ পাবলিকেশনের 'গল্পমালা' গুলি প্রকাশিত হবার পূর্বে নরেন্দ্রনাথের গল্পগ্রন্থগুলি খুব একটা সহজলভ্য ছিল না। যেহেতু তাঁর রচনা প্রচারধর্মী নয় তাই তাঁর প্রশংসালাভের ক্ষেত্রটি যেন সংকুচিত হয়ে গেছে। নরেন্দ্রনাথের স্বীকৃতিলাভের স্বল্পতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাই আলোচক বলেন — "মূলতঃ নরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রচার বিমুখ, সাহিত্যের কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হতেও তাঁর তেমন উৎসাহ ছিলনা। তাই সমসাময়িক কালের লেখকদের মধ্যে সংখ্যায় এত বেশি ভাল গল্প আর কেউ না লিখলেও তুলনায় স্বীকৃতি তিনি কিছুটা কমই পেয়েছেন।"[৩৩]

স্বীকৃতি ও পরিচিতির স্বল্পতা থাকলেও নরেন্দ্রনাথ শুধুমাত্র তাঁর সময়ে নন বাংলা ছোটগল্প জগতেই একজন অসামান্য ও উল্লেখযোগ্য শিল্পি। সহজ সরলতায়, দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষায় প্রাত্যহিক জীবনের কঠোর বাস্তবতার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন আর তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন নিজের হৃদয়ের উষ্ণতা। হৃদয়গ্রাহী তাঁর রচনাগুলিকে তিনি তাঁর মানসিকতা অনুসারেই শান্ত, স্নিগ্ধ ও সুস্থ সুষ্ঠুতায় প্রকাশ করেছেন। লেখার পিছনে যে অনেক চিন্তন, মননশীলতা আছে তা রচনার সহজ সরলতা ও সাবলীলতায় যেন চোখে পড়ে না কিন্তু তা হৃদয়কে নাড়া দিয়ে যায়। সময়ের চাহিদা মেটাতে নিজের রচনাকে জনপ্রিয়তা দেবার

জন্য সহজ ও সস্তা কোনো পন্থা তিনি গ্রহণ করেননি বরং নিজের মানসিকতা বুঝে তিনি চিরকাল 'ভালোবাসার গল্প'ই রচনা করে গেছেন। এই ভালোবাসার গল্পের সহজ স্নিগ্ধতা অথচ অনিবার্য প্রবল গতি, সংহতি ও লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা বাংলা ছোটগল্পের জগতে প্রকৃতপক্ষেই এক নতুন মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের শক্তিমত্তার পরিচায়ক।

-ঃঃ উল্লেখপঞ্জি ঃঃ-

১. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'গল্প লেখার গল্প', গল্পমালা - ১, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ১১.

২. 'ধ্বনি' পত্রিকার সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সাক্ষাৎকার, মে ১৯৬৮

৩. রত্না মণ্ডল ঃ 'নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে মধ্যবিত্ত সমাজ', 'বাংলা ছোট গল্প ঃ পর্ব-পর্বান্তর', সম্পাদনা তরুণ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৫৯

৪. অরুনকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৮২.

৫. শ্রী ভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প ও গল্পকার', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা, পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ) ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৩৮৭.

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র, ৩১শে আশ্বিন, ১৩৩৫.

৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ২০৮.

৮. তদেব, পৃষ্ঠা ১৯৯

৯. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'গল্প লেখার গল্প', 'গল্পমালা - ১', প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা - ১১.

১০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ১৯৯.

১১. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৬.

১২. সরোজ মোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ১৯৪.

১৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ২২০.

১৪. বীরেন্দ্র দত্ত ঃ 'বাংলা ছোট গল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (প্রথম খন্ড), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৩০৬.

১৫. সুকুমার সেন ঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', (পঞ্চম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,

কলকাতা, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৩৫৫.

১৬. শ্রীভূদেব চৌধুরী ঃ 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার', মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা পঞ্চম প্রকাশ (নতুন সংস্করণ), ২০০৩, পৃষ্ঠা - ৪১১.

১৭. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৩৩৮.

১৮. তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৩৮.

১৯. সরোজ মোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৫২.

২০. 'নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনাবলী', ২য় খন্ড, বিশেষ সংস্করণ ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ৬৩০.

২১. অরিন্দম গোস্বামী ঃ 'সুবোধ ঘোষ ঃকথা সাহিত্য', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ২০০১, পৃষ্ঠা - ২৬২.

২২. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ঃ 'শতবর্ষের বাংলা ছোট গল্প ঃ একটি রূপরেখা', 'দেশ' ৩রা আগষ্ট ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত।

২৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা -৩৫৮

২৪. নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ 'বলা বাহুল্য'। ('দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের ভূমিকা), 'উপন্যাস সমগ্র - ১', আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪, পৃষ্ঠা - ৭৫২.

২৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা -৩৭৪.

২৬. সরোজমোহন মিত্র ঃ 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প', তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তুলসী প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা - ২৭৮.

২৭. ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ'আমাদের কথা', 'প্রসঙ্গ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা সমীরবসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা -৫.

২৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ 'কালের পুত্তলিকা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃষ্ঠা -৩৭৫.

২৯. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬,

পৃষ্ঠা- ১৮১.

৩০. সমীর বসু ঃ 'নরেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের কয়েকটি চিহ্ন বিচার', 'প্রসঙ্গ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা - ৯৫

৩১. শরদিন্দু কর ঃ 'সাধারণ পাঠকের চোখে নরেন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প', 'প্রসঙ্গ নরেন্দ্রনাথ মিত্র', সম্পাদনা সমীর বসু, পদক্ষেপ সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০১, পৃষ্ঠা -৮৭

৩২. তদেব, পৃষ্ঠা -৯১

৩৩. মঞ্জুরী চৌধুরী ঃ 'ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা - ১৮৭

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্প থেকে যে সকল পংক্তি উদ্ধার করা হয়েছে সে সকল অভিজিৎ মিত্র সম্পাদিত ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পমালা ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কিশোর গল্প সমগ্র থেকে গৃহিত।